কাগ্রাম ও জোড়া টেরাকোটা মন্দির

ড. কালী চরণ দাস ও প্রবীর আচার্য

গ্রাম পরিচিতি: কাগ্রাম নামে এক গ্রাম, মহকুমা কান্তি এবং জেলা মুর্শিদাবাদ। পাশের গ্রাম মৌগ্রাম, কমবেশি তিন কিলোমিটার পুবে, পড়ে বর্ধমান জেলায়। দুই গ্রামের নামই পাখির নামে। কাগ্রাম হল কাকের নামে আর মৌগ্রাম এল ময়ূর থেকে। তবে অনেকেই এরকম নামকরণের উৎস, মোটেই পছন্দ করেন না, উচিতও নয়। বলেন, মৌগ্রাম আসলে গ্রামদেবী মধুমাতার নামানুসারে আর কাগ্রাম এসেছে কঙ্কগ্রাম ভুক্তি বেশ প্রাচীন এবং নামকরা এক ভুক্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু খোদ্ কাগ্রামে জবরদস্ত কোনও পুরাতাত্ত্বিক নজির নেই বলে অনেক সালে[১] পর্যন্ত এলাকা তার সঙ্গে জুড়ে দেন। তবেই প্রাচীনতার একটা ক্ষীণ সাক্ষ্যের সন্ধান মেলে।

লক্ষণসেনের আমলে বর্ধমান ভুক্তি ভেঙে গঠিত হয়েছিল কঙ্কগ্রাম ভুক্তি, এমনই অনেকের মত। আবার কেউ কেউ স্বাধীনভাবে কঙ্কগ্রাম ভুক্তির কথা তোলেন এবং তারই অবশেষ হিসেবে কাগ্রামকে দেখতে চান, আপত্তির কিছু নেই।[২] কিন্তু সুকুমার সেন বলেন– লক্ষণসেনের আমলে রচিত সদুক্তিকর্ণামৃতে কঙ্কণ নামে এক কবির প্রসঙ্গ আছে। তিনি কঙ্কণ পেয়ে পুরস্কৃত হন বলেই তাঁর গ্রামের নাম হয় কঙ্কগ্রাম। আর কঙ্কগ্রাম থেকে পরবর্তী কালে অপভ্রংশে কাগ্রামে রূপান্তর। চৈতন্য সমকালিন রামচন্দ্র খানের অনূদিত মহাভারতের (১৫৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দ) অশ্বমেধ পর্বে কঙ্কগ্রাম নামের উল্লেখ আছে[৩]–

কঙ্কগ্রাম স্থান আছে মধ্য রাঢ়াদেশে।
গঙ্গার নিকটে শুরু সর্বকাল বৈসে।।

অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দে রচিত গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণে (১১৫৮ সালে রচিত) কাগা মোগা গ্রামের নাম রয়েছে[৪]–

...এইরূপে ইন্দ্রাইন পরগণা বরগি লুটি।
কাগা মোগা-এ লুটে ওলন্দাজের কুটি।।
এই রূপে কাগা মোগা পোড়াইঞা
রাতারাতি পহছিলা জাউমাকান্দি গিয়া।।

স্বভাবতই একথা ভাবা বোধহয় ভুল হবে না যে গঙ্গারামের আগে থেকেই কাগ্রাম ও মৌগ্রামে ওলন্দাজ বা ডাচেদের কুঠি ছিল। তাঁরা নানা রকমের জিনিস-পত্র শিল্পীদের কাছ থেকে কিনে বিদেশে রপ্তানি করতেন।[৫] এরকমের পণ্যের মধ্যে রেশম-কুঠির ধ্বংসাবশেষ মৌগ্রামের কাছে বাবলা ও গঙ্গার সঙ্গম-স্থল কল্যাণপুরে পাওয়া গেলেও কাগ্রামে সেরকমের কোনও নির্ভরযোগ্য কুঠির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি। সেটা পাওয়া গেলে কাগ্রামের একটা প্রত্ন-নজির হিসেবে অবশ্যই বিবেচিত হত নিশ্চয়ই। হাই স্কুলের কাছে উঁচু ঢিবি দেখে অনেকে জোর দিয়ে বলেন যে কাগ্রামে হাইস্কুলের কাছে বৌদ্ধমঠ যে ছিল সেবিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। কিন্তু বোঝা যায় না তিনি ওটুকু দেখে কীভাবে এরকমে র সিদ্ধান্তে এলেন। তবে অতীতে রায়পাড়ার ষষ্ঠীতলায় বেশ কিছু লাঞ্ছিত প্রস্তর খন্ড ছিল। হয়ত সেগুলি কোনও প্রাচীন সৌধের ধ্বংসাবশেষ। হতে পারে সেগুলি কোনও বৌদ্ধ সংস্কৃতির লক্ষণ। কিন্তু যা হারিয়ে গেছে, তা নিয়ে কী ভাবে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায়? আপাতত যা দেখা যাচ্ছে তা হল তারকনাথ মুখার্জির বাড়িতে প্রায় পনেরো ইঞ্চি উচ্চতার রিলিফ পদ্ধতিতে বালি পাথরে খোদাই এক বিষ্ণুমূর্তি। পাওয়া গেছে বছর দশেক আগে পাশের এক পুকুর থেকে। মূর্তিটির বামদিকে পায়ের পাশে অষ্টভুজ পুরুষ মূর্তি আর ডানদিকে দ্বিভুজ মহিলা মূর্তি। এখন অস্পষ্ট ওই মূর্তিদ্বয় দেখে মনে হয় মূর্তিগুলির খোদাই সম্পূর্ণ হয়নি কিংবা কোনও সময় ভেঙে গেছে।

অনেকে আবার কঙ্কগ্রামকে কজঙ্গলের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত করেন। মনে হয় এত দূর না-এগোনোই ভালো। কেন-না হিউএন সাঙের কজঙ্গলের অবশেষে রয়েছে বর্তমানের ঝাড়খণ্ড প্রদেশের কাঁকজোল নামক এক গ্রামের নামে। বিশাল অঞ্চল জুড়ে, এমনকি গঙ্গাপাড়ের বহু অংশ জুড়ে কাঁকজোল পরগণা। খাজনা-পত্রের রসিদে এখনও ওই নামই বহাল আছে। আর সেখানকার পুরাতাত্ত্বিক নজিরের তো কোনও শেষ নেই। রাজমহল রয়েছে, তিনপাহাড় রয়েছে, রয়েছে তালঝাড়ি, সকড়িগলি কিংবা সাহেবগঞ্জ। আরেকটু এগোলেই বিক্রমশিলা বিহার। এদিকে ওদিকে, চারদিকে কেবল প্রত্ন-নজির, চোখ ফেরানোর কোনও অবসর নেই। কাজেই এই কঙ্কগ্রামে (কাগ্রামকে) কজঙ্গলের অংশবিশেষ হিসেবে ধরাটা ঠিক হবে না।

সালার থেকে ৫ কিলোমিটার পূর্বে ৩ কাটোয়ার ওপারে শাঁখাই ঘাট থেকে ১৮ কিলোমিটার উত্তর পড়ে কাগ্রাম, থানার সালার আর ব্লক ভরতপুর-২। বর্ধিষ্ণু লোকের বাস সেখানে। তবে যুগানুসারে আর পাঁচটা গ্রামের মতো বহু লোকই এখন বাইরে। কাগ্রাম মৌজার (জে. এল. নং ১০৪, আয়তন ৫১৩০ একর) দক্ষিণে পড়ে কেউগুঁড়ি ও ঝামটপুর বহরান আর পূর্বে মৌগ্রাম। আরও কিছুটা পুবে এগোলে পড়ে ভাগীরথী। উত্তরে তালিবপুর, বাবলা এবং বহড়া গ্রাম। তারও উত্তরে বাবলা নদী। আসলে বাবলা হল তিনটি নদীর মিলিত ধারা। দেওয়ার থেকে এসেছে ময়ূরাক্ষী। ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে

হিজল মৌজায় মিলিত হয়েছে কোপাই। ময়ূরাক্ষি ও কোপাই এর সম্মিলিত ধারার সঙ্গে মিশেছে দ্বারকা বা দাঁড়কা নদী। আর তা থেকে বাবলা। বাবলা নদীর দক্ষিণে নিকটবর্তী হল বাবলা গ্রাম। এখন সেটি এক বিখ্যাত গ্রামের মর্যদা পেয়েছে। কেন-না প্রতিবেশি বাংলা দেশের ভাষা আন্দোলনের শহিদ বরকতের জন্মভূমিই হল সেই গ্রাম। গ্রামের আশেপাশে প্রাকৃতিক কোনও কান্দর নেই। গ্রামের জল নিকাশীর ঢাল পূর্বমুখী, ভাগীরথীগামী। ক্যানেল ও দুই নদী বেষ্টিত গ্রাম হলেও কাগ্রামকে বন্যাপ্রবণ বলা যায় না।

পাড়া, ধর্ম, জাতি: কুড়ি হোক কিংবা বাইশ, কাগ্রামকে আসলে বলে বাইশ পাড়ার গ্রাম। প্রয়াত সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ অবশ্য কাগ্রাম প্রসঙ্গে ভলো কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন– একুশ পাড়া আঠারো পাড়া এসব বিশেষণ হল আসলে সমৃদ্ধ গ্রামের লক্ষণ মাত্র, আর কিছুই নয়।[৬] কাগ্রামকে সে-হিসেবেই দেখা যেতে পাতে। বাসগৃহের ৬০ শতাংশ পাকা, বাকিটা কাঁচা। পাড়ার নামগুলি জাতি, পেশা, পদবি ও দিক্ ভিত্তিক। যেমন–কামার পাড়া। তারপর তাঁতি, মিস্ত্রি, ঘটক, বাউড়ি বা বাগদি পাড়া, পশ্চিম শুঁড়ি, শাঁখারি, বায়েন, উত্তর মাঝি পাড়া, হাজরা, উত্তর সাহা, পূর্ব সাহা পাড়া, পাল, মিঞা, ঢালি, খানসামা, চবুতরা। মির, কাজি, মাঠ, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম, মধ্য পশ্চিম, রায় পাড়া, মহাশয়, দক্ষিণ দাস, রাজ, বাবু, ঘোষ, বাজার পাড়া, বেদে ডাঙা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য বিশ বা বাইশ সংখা কখন পেরিয়ে গেছে। তবু কাগ্রাম হল বাইশ পাড়ার গ্রাম। কায়স্থ ছাড়া গ্রামে প্রায় সব জাতিরই বাস আছে। ব্রাহ্মণ পরিবার রয়েছে কমবেশি ৩০০ ঘর। হিন্দু ও মুসলমানের আনুপাতিক হার যথাক্রমে ৬০ শতাংশ ও ৪০ শতাংশ। বেশ কিছু যোগীনাথ সম্প্রদায় থাকলেও তাঁদের ও বৈষ্ণবদের কবর দেওয়ার প্রথা লুপ্ত হয়ে গেছে। বৈষ্ণবদের প্রভাব, শাক্ত বা শৈবদের তুলনায় ক্ষীণ। গ্রামের হিন্দুদের সৎকার ঘাট হল ভাগীরথী তীরে কল্যাণপুর কুঠির ঘাটে। উদ্ধারণপুরও খুব দূরে নয়। কাজেই উদ্ধারণপুরের মহাশ্মশানকেও অনেকে নির্বাচন করেন। মুশলিমদের জন্য রয়েছে তিনটি কবরখানা। এখন সবকটিই গ্রামের সীমানার মধ্যে।

বাইশ-পাড়া গ্রামের ২০০১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুসারে বিবরণ এরকমের– জনসংখ্যা মোট ১৩০৯৩ জন, তারমধ্যে পুরুষ হলেন ৬৫৭৮ জন আর স্ত্রী ৬৫১৫ জন। তপসিলি শ্রেণিভুক্ত হচ্ছেন ২০২৮ জন, সে-জায়গায় আদিবাসী মাত্র ১৭ জন। গৃহের সংখা ২৬২৪ টি। সাম্প্রতিক কালে ভোটের বুথ নোট নয়টি এবং ভোটার সংখ্যা কমবেশি এগারো হাজার।

জীবিকা, ফল-মূল, পশুপাখি, পুকুর ইত্যাদি : রাঢ় বাংলার আর পাঁচটা গ্রামের মতো কাগ্রামেও রয়েছেন কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, কুটির শিল্পজীবী বা চাকুরিজীবী সম্প্রদায়। তা-সত্ত্বেও মূলত কৃষিপ্রধান গ্রামই বলা হয় কাগ্রামকে। সুবিধেও রয়েছে সেরকমের। ময়ুরাক্ষী ক্যানেলের দুটি শাখা গ্রামকে প্রায় ঘিরে মৌগ্রামের মাঠে লীন হয়ে গেছে। সরকারি গভীর নলকূপ যেমন একটি রয়েছে তেমনি রয়েছে ব্যক্তিগত অনেক অগভীর নলকুপ, জলের অভাব নেই। কাজে চাষবাস বেশ ভালে রকমেই চলে। তবে ফসল বলতে ওই গতানুগতিক আউস, আমন, বোরো, গম, সরষে, ছোলা, মুসুরি, আলু, তিল, আখ ইত্যাদি। গৃহস্থের ছোটোখাটো সব্জির বাগান থাকলেও ব্যবসাভিত্তিক সব্জি চাষের কোনও উদ্যোগ নেই। গাঁয়ে বদলের চাষ প্রায় ৫০ শতাংশ এবং বাকিটা বলা বাহুল্য কলের লাঙল।

গ্রামের মৎস্যজীবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, তা সাকুল্যে প্রায় ৩০০ ঘর। গ্রামে প্রচুর পুকুর আছে। পুকুরগুলির নাম বেশ বিচিত্র যথা, উত্তর দক্ষিণে লম্বা পুকুর হল ঢেউরে, শ্রীমন্ত, তারা সাগর, সাহা পুকুর, বাবু পুকুর, সরবসে প্রভৃতি। চতুষ্কোণ হল তারা, সামন্ত, নন্দন, তালবনা, বাঁধা পুকুর, বংশী, হাতটোলা ইত্যাদি। পূর্ব পশ্চিম লম্বা হল বক্সি পুকুর, মল্‌কে, মাঠের বাঁধা পুকুর, মঠের পুকুর, বেনে পুকুর ইত্যাদি। একসময় নিয়মমতো প্রতিষ্ঠাও করা হয়েছিল সেগুলি। তার মধ্যে বেশ কটিতে রয়েছে বাঁধানো ঘাট, যা এখনও ব্যবহার্য। পুকুর ছাড়াও মৎস্যজীবীদের প্রধান কর্মক্ষেত্র মূলত ক্যানেল। ডিম ফোটানোর জন্য রয়েছে দুটি হ্যাচারি। সেখান থেকে ব্যবসাভিত্তিক মাছের চারা বাইরে রপ্তানি করা হয়, লাভও হয় বেশ ভালই। মুরগি চাষেও এগ্রাম পিছিয়ে নেই, বড়ো এবং মাঝারি মাপের দুটি পোলট্রি রয়েছে গ্রামে।

ওদিকে উন্নতমানের তাঁত শিল্পে নিযুক্ত রয়েছেন প্রায় আড়াইশো ঘর তাঁতি পরিবার, বৈদ্যুতিন তাঁত যন্ত্রের চালু কারখানা রয়েছে একটি। পাশাপাশি তাঁতিদের একটি সমবায় সমিতি থাকলে ভালো হত নিঃসন্দেহে। তাও ছিল অতীতে, আছেও। সে-হিসেবে শাঁখা, বেত, বাঁশ, সোলা, বিড়ি, মূর্তি-তৈরি বা দারুশিল্প বেশ নামকরা। এ-ছাড়াও কামার, কুমোর, ময়রা বা ছুতোরেরা নিজেদের পেশায় যথাযথ নিযুক্ত রয়েছেন। সরকার অনুমোদিত দেশি মদ তৈরির মাতাল-শালাও যে নেই তা নয়, গ্রামের পশ্চিম শুঁড়ি পাড়ায় সেরকমের একটি মাতাল -শালা প্রায় সব সময়ই জমজমাট। গ্রামে যেসব পশুপাখি দেখা যায় তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। সরীসৃপের বোলাতেও তাই।

হাট-বাজার, মেলা ইত্যাদি : গ্রামে স্থায়ী বাজার আছে তা খুব বড়ো মাপের নয় স্বভাবতই। বাজার-পাড়াতেই হাট বসে শনি আর মঙ্গলবারে। আগে হাট বসত অন্যত্র কিন্তু জমিদার রায়চৌধুরী পরিবার হাটটিকে বাজার পাড়ায় স্থানান্তরিত করেন। মন্ডল বা মোড়প তলা রয়েছে তিনটি। ওই তিন জায়গাতেই গাজনের মেলা বসে চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কের দিন।

প্রায় তিন-শো গাজন সন্ন্যাসী নানা রকমের কৃচ্ছ্রসাধন ক্রিয়া দেখান। এখানকার বা মৌগ্রামের গাজনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জিভে পেটে গলায়। কোমরে, ভূতে বান-ফোঁড়া। বঁটির উপর ঝাঁপ দিতেও দেখা যায় কাউকে কাউকে। গাজনের মেলা ছাড়াও সাত দিন একনাগাড়ে মেলা বসে জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় মহাশয় পাড়ায়।

লোক-সংস্কৃতি : বিচিত্র হল গ্রামের কয়েকটি প্রতিষ্ঠা করা বৃক্ষ, খুব একটা প্রাচীন নয়, শ দেড়েক আগেকার, রায়ের পাড়ার পাকুড় গাছ হচ্ছে সেরকমেরই একটি গাছ। বৈশাখ মাসে জল সিঞ্চন করে তার পুজো হয়। দক্ষিণ মাঠে কেঁউগুড়ি যাওয়ার পথে পড়ে ঢেলাই চন্ডী তেঁতুল গাছ। লোকেরা তেঁতুল গাছ তলায় মানত করে এবং ঢেলা বেঁধে দেয়। কখনও ঢেলা ছুড়েও দেয়। অনাবৃষ্টি হলে চাষিভায়েরা গাছতলায় ঢেলাই চন্ডীর পুজো করে। দক্ষিণ মাঠে আরও একটি তেঁতুল গাছ আছে, তার তলায় রয়েছে গৃহদেবীকে কুলে নামিয়ে বজরা চালানোর চেষ্টা করেন। বজরা সচল হয় কিন্তু দেবী আর বজরায় ওঠেন না, কুলেই থেকে যান। সে থেকে দেবীর নাম হয় কুলাই চন্ডী। কবি কঙ্কণের চন্ডীমঙ্গলে অবশ্য এরকমের কোনও উপাখ্যান কার্যত নেই।

রায় পাড়ার প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় রয়েছে ধর্মরাজের থান। পাশেই মাটির মন্দির। মন্দিরের ভেতরে কাঠের ছপ্পর-ওয়ালা সিংহাসনে রয়েছে একটি ইঞ্চি দুয়েকের পাথরের শিবমূর্তি, কিছু পাথরের টুকরো ও একটি পিতলের মনসা। আর সিংহাসনের সামনে রয়েছে এক ফুট উঁচু, এক ফুট লম্বা ও নয় ইঞ্চি চওড়া পাথরের একটি পাদপীঠ। তার উপরে কোনও মূর্তি সংযুক্ত থাকার মতো কোনও চিহ্ন নেই। প্রস্তরখন্ডটি কী হিসেবে ব্যবহার করা হত তাও বোঝার কোনও উপায় নেই এখন। আবার অনেকেই সেখানে একটি পুরোনো মন্দির ছিল বলে দাবি করেন কিন্তু এখন সেরকমের কোনও নজির কিছু দেখা যায় না। যাই হোক্, ধর্মরাজ সেবার ভার অবশ্য গ্রহণ করেছেন রায় পরিবার। প্রতিবছর বৈশাখী পূর্ণিমাতে ধর্মরাজের পুজো হয় এবং খুব ধূমধামের সঙ্গে। গাজনে প্রচুর সন্ন্যাসী থাকেন, ভক্তরা বাণ ফোঁড়েন, মুক্তস্নান ও ভাঁড়াল খেলাও বাকি থাকে না।

মৎস্যজীবী, কৃষিজীবী কিংবা শ্রমজীবীদের প্রধান আরাধ্যা দেবী হচ্ছেন মনসা। কাগ্রামে স্থায়ী কয়েকটি মনসা-তলা রয়েছে। যেমন– উত্তর মাঝি পাড়া, রায়ের পাড়া, মাঝি পাড়া, বাউরি পাড়া ও ডোম পাড়ায়। কোথাও কোনও মূর্তি নেই এবং নেই নিত্যসেবার বালাই। মনসা পূজোর দিন গ্রামে মৃন্ময়ী মনসা মূর্তির পুজো হয় কমবেশি কুড়িটি। সে-জায়গায় পাশের গ্রাম মৌগ্রামে স্থায়ী মনসা মন্দির যেমন আছে তেমনি মন্দিরে অধিষ্ঠিত রয়েছে প্রস্তরময়ী মনসা দেবী। স্বভাবতই নিত্য পুজোর ব্যবস্থা আছে। কাগ্রামের এক বটতলায় রয়েছে শীতলার থান। শান্তিময়ী দাসী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই পুজো চালু করেছিলেন বলে তিনিই মূলত ফুলজল অর্পণ করে থাকেন।

গ্রামে ভাদুগানের আসর যেমন জাঁকজমক করে বসে তেমনি বাইরে থেকেও বিভিন্ন দল তাঁদের সৃষ্টি শোনাতে আসেন এখনও। কাগ্রামের মানুষেরাও তেমনি ভাদু গাইতে বাইরে যান। ভাঁজো, নবান্ন, দাওন ও পৌষালু, ঝাপান, সঙ ইত্যাদির চলন এগ্রামে এখনও আছে। বোলানের দল রয়েছে গোটা পাঁচেক। কিন্তু কীর্তনের দল রয়েছে মাত্র একটি, গৌর ঘোষ হলেন তার মূল গায়েন। রায়বেঁশে নাচ আগে খুব জনপ্রিয় ছিল বটে তবে এখন তা বিলুপ্তির পথে।

ভাঁজো পূজা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই, গ্রামবাসীরা সকলেই এপ্রসঙ্গে কিছু না কিছু জানেন। সংক্ষেপে– ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন ইন্দ্রপুজো তলার মাটির সঙ্গে ইদুরের মাটি মিশিয়ে মাটির সরায় কিছু রবিশস্যের বীজ ছড়িয়ে, জল আদি দিয়ে অন্ধকারে রাখা হয়। এটিই হল প্রাথমিক কাজ। সপ্তাহ খানেক পরেওই বীজগুলি লম্বা লম্বা অঙ্কুরে পরিণত হয়। অঙ্কুরিত বীজপাত্র রাখা থাকে ভাঁজো দেবীর সামনে। ভাঁজো দেবীর মুখটি হল আসলে গ্রামে তৈরি মাটির পুতুলের আদলে। সেটিকে কাঠির সাহায্যে দাঁড় করিয়ে কাপড়, ফুলের মালা আদি পরানো হয়। তখন দেবীকে দেখে একটি বড়ো আকারের পুতুলের মতো মনে হয়। তারপর দেবীর উদ্দেশে চলে ঢোল সহযোগে নৃত্যগীত ও নানা রকমের ছড়া-কাটা। মোটামুটি এই হল ভাঁজো পূজার সংক্ষিপ্ত ইতিকথা। লোক বিশ্বাস ভাঁজো নাচ হল আসে ইন্দ্রসভায় অপ্সরাদের নাচের অনুকরণ মাত্র। এই পুজো বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদে বহুল প্রচলিত। বলা বাহুল্য এই পুজো মূলত কৃষি বিষয়ক পুজো তথ্য বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা যাচাই করে উৎকৃষ্ট বীজ নির্বাচনের পরব।

আবার নতুন চাল খেতে হলে দেবতাদের উদ্দেশে তা নিবেদন করার অনুষ্ঠানকে বলে নবান্ন। সে-সময় গ্রামের প্রতিটি পরিবারে নানা রকমের ব্যঞ্জন সহযোগে নতুন অন্ন পরিবেশন করার রীতি আছে। পশুপাখিরাও বাদ যায় না। দাওন উৎসব সেবিচারে পরিবারিক উৎসব। জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই উৎসব পালিত হয়, মুসলিমরাও বাদ যায় না। সে সম্পর্কে অনেকের একটা ক্ষীণ ধারণা থাকতে পারে। ফসল তোলা শেষ-হওয়া উপলক্ষ্যে পারিবারিক যে উৎসব পালিত হয় তাকে বলে দাওন উৎসব। আমন ধান কাটা বছরের মতো শেষ হল। তা বোঝাই করা হল গাড়িতে। ঠিক তখনই এক আঁটি ফসল গৃহস্থ স্বয়ং গাড়ির পিছনে পিছনে মাথায় করে বয়ে নিয়ে বাড়ি আসবেন। এবং বাড়ির বিশেষ জায়গায় তা রেখে দেবেন। সেদিন পাড়ার বা সাধ্যানুযায়ী গ্রামের সকলকে নতুন চালের পায়েস সহ মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন করবেন। এই উৎসবকেই বলে দাওন। লোককথায় প্রচারিত আছে–মুনিশ জব্দ জাওনে, আর খাইয়ে জব্দ দাওনে। আসলে দাওনে খাওয়ার বাহুল্য কথাটাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বলা বাহুল্য এই উৎসবের কোনও নির্দিষ্ট দিন নেই ঠিকই তবে

সাধারণত পৌষ বা মাঘ মাসেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এখন তো আবার অগ্রহায়ন মাসেই ধান কাটা সারা হয়ে যাচ্ছে, অতএব দাওন হচ্ছে অগ্রহায়নেই।

পৌষালু, পৌষালি বা পৌষলা সাধারণত পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত কোনও দিনে গ্রামবাসীরা সমবেত ভাবে গ্রামের বাইরে কোনও ভালো জায়গায় একসঙ্গে রান্না করে খায়। একেই বলে পৌষালু। আলুর সঙ্গে একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে কেন-না নতুন আলু মোটামুটি পৌষ মাসেই ওঠে।

বৈশাখে সারা মাস ধরে সন্ধেবেলা চলে হরিনাম সংকীর্তন সহ গ্রাম পরিক্রমা। সাধারণত প্রতিদিনই কোনও না কোনও পরিবারে ওই সংকীর্তনের দলকে জলযোগে আপ্যায়ন করা হয়। সংক্রান্তির দিনে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের রাধাকৃষ্ণ সাজিয়ে সংকীর্তন সহ গ্রাম পরিক্রমা সেরে শেষ-উদ্‌যাপন করা হয় ভাগীরথী তীরে কল্যাণপুরে কুঠির ঘাটে। কোথাও কোথাও এই উৎসবকেই ধুলোট বলে। ওই দিন কল্যাণপুরের ঘাটেই আশপাশের গ্রাম থেকে কমপক্ষে বারো চোদ্দটি হরিনামের দল এসে সমবেত হয়। সেখানে রয়েছে সুভাষসাধুর আশ্রম। অনেক গ্রামের দল সে-আশ্রমেই মচ্ছব রান্না করে খান। আবার কেউ কেউ পাশের জায়গায় স্বতন্ত্রভাবে রান্না করেন। তা-ছাড়া কাগ্রাম-সহ পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রামে পুরো কার্তিক মাসের ভোর বেলায় ভৈরবী সুরে রাধাকৃষ্ণ বা মহাপ্রভু চৈতন্য বিষয়ক পদ গেয়ে গোটা গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। একে বলে টহল-দেওয়া।

কাগ্রামে আরও একটি বিচিত্র উৎসব পালন করেন গ্রামের গোয়ালা সম্প্রদায়। জন্মাষ্টমীর পরের দিন দুপুর বেলা তাঁরা সকলেই তাঁদের নিজেদের গোরু বাছুর জড়ো করেন হাসপাতালের মাঠে। তারপর সংগৃহীত চাঁদার টাকায় কেনা হয় একটি তাজা শুয়োর। ওই শুয়োরটিকে গোরুর পালের মাঝখানে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপরই তাঁরা তাঁদের গোরুদের লেলিয়ে দেন ওই শুয়োরের পিছনে। গোরুগুলি ক্রমাগত শুয়োরটিকে গুঁতোতে থাকে। শুয়োর পালানোর কোনও পথ খুঁজে পায় না। শেষে রক্তাক্ত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। যে গোয়ালার গোরু শেষ আঘাতে শুয়োরটিকে মেরে ফেলতে সক্ষম হয়, তাঁর গোয়ালে পুঁতে দেওয়া হয় ওই শুয়োরের মৃতদেহ। তাঁদের বিশ্বাস এরকমের তুকে গ্রামের সকলের বাড়িতে গোধন বৃদ্ধি পাবে। যাঁর গোয়ালে মৃত শুয়োরটি শায়িত থাকে তাঁকে পরের দিন সকল স্বজাতিকে ভোজে আপ্যায়ন করতে হয়। এটিই সেখানকার একটি প্রথা। সাধারণত এরকমের প্রথা অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না।

আার ঝাঁপান হল আসলে মনসা দেবীর পুজো উপলক্ষ্যে বাজনা-সহ গান। তার সঙ্গে মনসার বাহন সাপও থাকতে পারে। আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাসের পঞ্চমী ও ভাদ্রের সংক্রান্তিতে মূলত মনসা পুজো হয়। পুজোর পরে গান গেয়ে সাপের খেলা। সাধারণত একে বলে ঝাঁপান। ঝাঁপানের প্রস্তুতি মাস খানেক আগে থেকেই চলে।

অনেকের মতে জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অতীতে চৈত্র মাসে দৈত্য দানবের বেশ ধরে লড়াই এর মহড়া করতেন। তা থেকে নাকি আজকের সঙের উৎপত্তি। কয়েক দশক আগে কাগ্রামে সঙ-এর বেশ প্রচলিত ছিল। শঙ শব্দটি এখনও একটি চালু শব্দ। সে অর্থেই সঙের পরিচিতি। কোনও কোনও সময় সঙ অশ্লীলতার সীমানাও অতিক্রম করে ফেলে। কাগ্রামে পূর্ণচন্দ্র সাহা পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে সঙের পরিকল্পনা করতেন আর সঙ সাজতেন শক্তিপদ ঘোষ, পাঁচকড়ি পন্ডিত, সমীরণ সাহা, জংলা তাঁতি, পূর্ণচন্দ্র তাঁতি প্রমুখেরা। বোলানের অনুকরণে সামাজিক ঘটনা নিয়েও সঙের পরিকল্পনা হত। এখন অবশ্য সঙের প্রচলন অনেকটাই কমে গেছে।

বোলান একটি অতি পরিচিত শব্দ। সাধারণ চৈত্র শেষে বোলানের মূল উৎসব হয়। তার বহু আগে থেকেই প্রস্তুতি চলে। কাগ্রামে বোলানের ভালো রকমের চল আছে, এখন চল আছে কমবেশি পাঁচটি। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে উৎকৃষ্ট পালাকার ছিলেন কাগ্রাম উত্তর পাড়ার দ্বিজেন চক্রবর্তী আর রায় পাড়ার যুগতলার বঙ্কিম মুখার্জি। ষাটের দশকে বিশিষ্ট পালাকার ছিলেন রামকিঙ্কর সরকার (অবধূত মাস্টার)। তাঁর কাছে বিভিন্ন বোলানের দল পছন্দ মাফিক গানের সুর ও বিষয় নির্বাচন করে নিয়ে যেতেন। তিনি ওই সুর বজায় রেখে বোলানের উপযোগী কথা বসিয়ে দিতেন। কাগ্রামের কয়েকজন বোলান শিল্পী হলেন বলরাম মুখার্জি, রাধাবিনোদ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ দাস, শান্তি মুখার্জি প্রমুখ। মহিলা সাজতেন হারু মাঝি, বিপদ ঘোষ, মিলন হাজরা, অর্জুন দাস প্রমুখ। বিশিষ্ট বাজনদার হিসেবে সুধীর সাহা, ভুলু মাঝি, বিশ্বনাথ সাহা, লক্ষ্মীনারায়ণ সেনগুপ্ত, বিভূতি সাহা, জগন্নাথ দাস প্রমুখের নাম এখনও অনেকের স্মরণে আছে। তা-ছাড়া ডাক বোলান লিখতেন রামচন্দ্র নাথ, কুবের মন্ডল, এককড়ি কর্মকার প্রমুখ। পোড়া বোলান লিখতেন নারায়ণ প্রামাণিক, কালু মুখার্জি, চন্ডীচরণ ভট্টাচার্য, নিমাইচন্দ্র ঘোষ। পোড়া বোলান শিল্পী ছিলেন নুটু ঘোষ, মাখন বাগচি, নিরঞ্জন দাস। মহাদেব হাজরা প্রমুখ। বর্তমানের পালাকার হচ্ছেন সুবীর পাল ও মিন সাহা। বলা বাহুল্য বোলানের অস্তিত্ব কাগ্রামে এখনও মুছে যায়নি।[৮]

অতীতে গ্রামে পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠের লড়াই নামে এক উৎসব হত। পিঠে তৈরি ও খাওয়ার প্রতিযোগিতাও ছিল সেসঙ্গে। খাওযার পর ঢোল-সহ দৈহিক কুস্তি-লড়াই ছিল এক উপভোগ্য বিনোদন। কিন্তু অন্যান্য উৎসবের মতো এই উৎসবও ক্রমশ মাধুর্য হারিয়ে কদর্যের রূপ নেয়। পিঠের বদলে ছোড়া হতে থাকে ঢিল বা কাদা। স্বভাবতই সে-উৎসব এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

একসময় পাড়ায় পাড়ায় অনেকগুলি অপেশাদার যাত্রার দল ছিল। মূলত সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় তাঁদের প্রদর্শনী হত। সম্ভবত টি.ভি. ও ডিজিট্যাল সিনেমা ইত্যাদির প্রকোপে আজ তা বন্ধ হওয়ার মুখে। শুধু উত্তর পাড়ার

নাইটিঙ্গেল ক্লাব টিমটিম করে এখনও জ্বলছে। তবে আনন্দের কথা, তাঁরা বাইরে থেকে পুরস্কারও জিতে আনছেন। বর্ষাকালের একটি উপভোগ্য খেলা হল ঢোল বাজিয়ে কবাটিখেলা। এগ্রামের ফুটবল খেলার গৌরব রয়েছে। ফুটবল খেলার মাঠ রয়েছে চারটি। রাজ্য স্তরের খেলোয়াড় সুমিতাভ সেনগুপ্ত ও সন্তোষ সেনগুপ্তের বাড়ি এগ্রামেই। তা-ছাড় জেলা স্তরের খেলোয়াড়েও ঘাটতি নেই। যেমন রয়েছেন মহম্মদ মসবর, বিজয়শঙ্কর চৌধুরী, শান্তি মুখার্জি, প্রবীর দাস, কোন্দকার সওকত। রবীন্দ্রনাথ দাস, পলাশ দাস, রাজর্ষি ব্যানার্জি প্রমুখ। টেনিস ও ব্যাডমিন্টন খেলাও এগ্রামে বেশ জনপ্রিয়। খেলা-ধুলা ও গ্রাম্য সংস্কৃতিতে উৎসাহ জোগাতে গোটা কুড়ি ক্লাব রয়েছে গ্রামে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—নাইটিঙ্গল, পশ্চিম পাড়া, ঢালিপাড়া, রায়ের পাড়া, আগন্তুক, নবারুণ সংঘ ইত্যাদি। সব ক্লাবের স্থায়ী ঘর নেই। মাটির ক্লাব-ঘর আছে ছ'টি এবং চারটি হল পাকা। অতীতে পল্লীমঙ্গল সমিতি নামে একটি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কিন্তু ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের প্রাক্কালে অজ্ঞাত মনোমালিন্যের কারণে ক্লাবটির অস্তিত্ব মুছে যায়।

অফিস-আদালত : গ্রামের পঞ্চায়েত বা পোষ্ট অফিস (পিন ৭৪২৪০১) রয়েছে গ্রামেই। তা-ছাড়া রয়েছে বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের শাখা, কৃষি উন্নয়ন সমবায়, ক্যানেল অফিস, বিদ্যুৎ অফিস, পি.এইচ.ই ট্যাঙ্কসহ জলসরবরাহ ব্যবস্থা, রাজস্ব পরিদর্শকের কারণ, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদি। হাসপাতালের সরকারি চিকিৎসক অনেক ক্ষেত্রে বাইরে থেকে আসেন। কেন-না স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোয়াটার্সগুলি মোটেই বাসযোগ্য নয়। জল বা বিদ্যুতের সংযোগও অব্যবস্থাপনার কারণে বিচ্ছিন্ন। গ্রামে বাইরে থেকে এসে দু-জন বেসরকারি চিকিৎসক চেমার করেন। একজন আয়ুর্বেদের, নাম স্যতবান মন্ডল এবং দ্বিতীয় জন অ্যালোপ্যাথির নাম এন.সি.রায়। গ্রামে দুটি অনুমতিপ্রাপ্ত স্থায়ী ওষুধের দোকান আছে। কার্যত গ্রামের সব রকমেরই স্থায়ী দোকান-পাট রয়েছে যেমনটা থাকে শহরে। আবার সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য আজকাল তো মোবাইলের টাওয়ার থাকটা অত্যন্ত জরুরি। কাগ্রামে সেরকমের টাওয়ারও রয়েছে মোটামুটি দুটি, একটি বি.এস.এন.এল. এর আর অন্যটি ভোডাফোনের। কাজেই গ্রামের টাওয়ার সমস্যা নেই। গ্রামে ল্যান্ডফোন লাইন আছে। তবে প্রায়শ ওই লাইন অচল থাকে। চেষ্টা করেও সচল করা যায় না। সেকারণে অনেকেই ল্যান্ড লাইন কেটে দিয়েছেন, মোবাইল ফোনেই কাজ চলে যায়।

শিক্ষা-দীক্ষা : শিক্ষার পরিবেশ যে গ্রামে ছিল তার প্রমাণ রয়েছে অতীতের দুটি টোলের নামে। একটির নাম দ্বিজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী টোল আর দ্বিতীয়টি রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের টোল। গ্রামে একটি পুকুরের নাম সাতটোল পুকুর। অনেকে সাতটোল নামের তাৎপর্য হিসেবে সাতটি টোলের প্রসঙ্গ তোলেন। টোলা বলতে যে পাড়াও বোঝায়, সে প্রসঙ্গে অবশ্য কোনও উচ্চবাচ্য নেই। তাঁরা শুধু বলেন - অতীতে গ্রামে সাত সাতটি টোল ছিল। রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের টোলটি ছিল শ্রেষ্ঠ। আর বলা বাহুল্য রঘুনন্দন ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী এক পন্ডিত। তাঁর খ্যাতি গোটা বাংলা জুড়ে প্রচারিত ছিল। গ্রামের অনেকে এই রঘুনন্দন মহাশয়কে বিখ্যাত স্মার্ত রঘুনন্দন হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চান। কিন্তু প্রচলিত পুস্তকাদিতে স্মার্ত রঘুনন্দনের জন্মস্থান নবদ্বীপ বলা হয়েছে।[৯] এখন অবশ্য অন্যান্য জায়গার মতো কাগ্রামের প্রাচীন টোলগুলিরও কোনও হদিস পাওয়া যায় না। সেজায়গায় গ্রামে রয়েছে চারটি শিশুশিক্ষা কেন্দ্র ও চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয় যেমন— জাহ্নবীবালা এফ. পি ও ঢালি পাড়া এফ. পি। খ্যাতনামা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে একটি, প্রতিষ্ঠা- কাল ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ, প্রতিষ্ঠাতা মোতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, জমিদার হীরালাল রায়চৌধুরী প্রমুখ। শুরুর সময় মোট ছাত্র ছিল ৭৫ জন। ক্লাস হত জমিদারের চন্ডীমন্ডপে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়া যায় ওই বছরেই। মৌগ্রাম যাওয়ার রাস্তার উত্তর দিকে কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, কালীকিঙ্কর রায়চৌধুরী ও ইন্দ্রকালী রায়চৌধুরী প্রমুখেরা মোটামুটি বিদ্যালয়ের জন্য ৩৮ শতকের মতো জমি দান করেন। পরবর্তী কালে বেচুরাম দাস, কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে আরও কয়েক শতক জায়গা স্কুলের হেফাজতে আসে। এ-ছাড়াও তিনশো টাকার বিনিময়ে খেলার মাঠের জন্য ৩৬ শতক জায়গা কেনা হয়েছিল। ১৯৭৪ খ্রিস্টাদে ব্রহ্মপদ রায়চৌধুরী দশ হাজার টাকা মূল্যের জমি স্কুলকে দান করেন। তা-ছাড়া পঙ্কজিনী দাসী, উমাঙ্গিনী দাসী, ভবানীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রচুর ভূসম্পত্তি স্কুলের নামে দান করেন। পরবর্তীকালে গৌতম চ্যাটার্জি দান করেন হাজার কুড়ি টাকা। প্রথম দিকে তিনটি মাটির ঘর তৈরি হয়। সরকারি অর্থসাহায্য তখনও পাওয়া যায়নি। জমিদারদের কয়ালি প্রথা থেকে প্রাপ্ত অর্থে বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করা হত। লালগোলার রাজা বিদ্যালয়ের নৈঋত কোণে একটি ইন্দারা খনন করিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবেই মানুষের দান সমৃদ্ধ হয়ে বিদ্যালয়টি বর্তমানে যথযথ ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। অতীতে খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ের অগ্রগতির জন্য যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন।[১০]

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এন্ট্র্যান্স পরীক্ষায় স্কুলের ছাত্রেরা প্রথম বসে। সেবছরের সফল ছাত্রের নাম হল— ১ম বিভাগে তারাপ্রসন্ন চৌধুরী, দ্বিতীয় বিভাগে শিবচন্দ্র চ্যাটার্জি ও বটকৃষ্ণ ঘোষ, ৩য় বিভাগে আশুতোষ দত্ত ও দামোদর হাজরা। এছাড়া ভূপতিভূষণ ব্যানার্জি ও আশুতোষ মুখার্জি আংশিক ভাবে সাফল্য লাভ করেন। গোপেশ্বর দত্ত মহাশয় প্রথান শিক্ষক থাকাকালীন স্কুলের সম্পাদক ধীরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সাত বছর ধরে চার হাজার টাকা করে বিদ্যালয় অনুদান পেতে থাকে। সে-টাকায় পুবদিকের তিনটি কুঠুরি ভেঙে প্রথম পাকা ঘর তৈরি

হয়। বিদ্যালয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে উচ্চমাধ্যমিক এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার অনুমতি পায়।

কাগ্রাম স্কুল থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে স্বগ্রাম নিবাসী শ্রীঅমরনাথ মুখার্জি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাঁর সুপুত্র বিদেশবাসী গ্রামের সুসন্তান অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় স্কুলের উন্নতি বিধানের জন্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা ও পরে বিল্ডিং -এর জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন। সেসূত্রে ১৪/৭/২০০৪ তারিখ থেকে তাঁর পিতার নামে ওই স্কুলের নামকরণ করা হয়েছে অমরনাথ মুখোপাধ্যায় উচ্চ বিদ্যালয় (কো-এড)।[১১]

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সংখ্যা বিচার করে একটি নতুন বিষয় উঁকি দেয়। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে কাগ্রামের মতো একটি গ্রামীণ বিদ্যালয়ে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে মোট ছাত্র ৬৮১ এবং মোট ছাত্রী ৭১৩। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে মোট ছাত্র ৭১১ এবং মোট ছাত্রী ৬৬৪। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে মোট ছাত্র ৭২৬ এবং মোট ছাত্রী ৭৬৫।

অর্থাৎ মাঝের বছর বাদ দিলে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী সংখ্যা বেশি। কিন্তু প্রকাশিত জনসংখ্যার বিচারে মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে কম। এই ব্যতিক্রমগুলি ভবিষ্যতের সামাজিক কাঠামোতে একটি বিপুল পরিবর্তন আনবে বলে ধারণা।

ওদিকে খুব আনন্দের কথা যে কাগ্রামের মতো সাধারণ গ্রামেও একটি বেসরকারি বি.এড ও একটি ডি.এড কলেজ সম্প্রতি চালু হয়েছে। দুটি কলেজরই সভাপতি হলেন অমরচাঁদ কুন্ডু এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুনীল কুমার ঘোষ। সালার থেকে কাগ্রামের মাঝপথে মোট দশ বিঘা জায়গায় কলেজ দুটি অবস্থিত। ছেলে ও মেয়েদের স্বতন্ত্র হোস্টেল আছে। এই সমস্ত সম্ভব হয়েছে কাঁদরা নিবাসী জনসেবক অমরচাঁদ কুন্ডু মশায়ের আর্থিক আনুকূল্যে ও প্রচেষ্টায়। তাঁর বদান্যতার শেষ নেই। কান্দরাতেও তিনি একটি সাধারণ মহাবিদ্যালয় স্থাপনায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নামে ওই কলেজের নামকরণ হয়। নাম কান্দারা রাধাকান্ত কুন্ডু মহাবিদ্যালয়। কাগ্রামের কলেজগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরকমে।

শ্যামাঙ্গিণী কুন্ডু কলেজ অফ এডুকেশন। শ্যামাঙ্গিণী হল অমরচাঁদ কুন্ডুর মায়ের নাম। কলেজটি এন.সি.টি.ই অনুমোদিত কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটি বি.এড কলেজ। প্রতিষ্ঠা কাল ১৯/১০/২০১২। মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১০০ জন। মোট শিক্ষক ৯ জন। অশিক্ষক কর্মী ৬ জন। শিক্ষা কাল ১ বছর। সম্পাদক বিমলেন্দু কুন্ডু।

ডলি কুন্ডু কলেজ অফ এডুকেশন। ডলি কুন্ড হল অমরচাঁদ কুন্ডুর স্ত্রীর নাম। কলেজটি এন.সি.টি.ই অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের অধীন একটি ডি. এড কলেজ। প্রতিষ্ঠা কাল ০৪/১০/২০১২। মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৫০ জন। মোট শিক্ষক ৭ জন। অশিক্ষক কর্মী ৩ জন। শিক্ষা কাল ২ বছর। সম্পাদক ডলি কুন্ডু।

মাঠ-পাড়ায় একটি বেসরকারি মাদ্রাসা রয়েছে, নাম নুরুল উলুম, স্থাপিত ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ। গ্রামে কিছু সহৃদয় মানুষের চেষ্ঠায় ওই মাদ্রাসাটির জন্ম। এখানে দুঃস্থ ছাত্রদের নিখরচায় থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আলিম ও ফাজির দুটি পাঠ্যসূটি পড়ানো হয়।

অতীতে সন্ন্যাসী সেনগুপ্ত, বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের চেষ্টায় গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হয়েছিল বটে তবে কিছুদিনের মধ্যেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়। কিছুকাল পরে গ্রামবাসী অনেকে মিলে[১১] কাগ্রাম নবারুণ সংঘ নামে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। অনেকে আবার তাঁদের পারিবারিক সঞ্চয় থেকে বহু পুস্তক পাঠাগারে দান করেন। বর্তমানে ওই গ্রন্থাগারটিই সকারি অনুদান-প্রাপ্ত গ্রন্থাগার রূপে স্বীকৃত হয়েছে। পুস্তক সংখ্যা ৪৮০০, গ্রন্থাগারিকের নাম বরুণ ব্যানার্জি। মূলত তাঁর চেষ্টাতেই এখন রাজ্য সরকারের সাহায্যে দ্বিতল পাঠাগার গৃহ নির্মিত হয়েছে। গ্রামে কোনও প্রাচীন পুথির হদিস পাওযা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নিকটবতী মৌগ্রাম থেকে অতীতে কাশীরাম দাসের মহাভারতের পুথি পাওয়া গেছিল।[১২] গ্রামের গুণীজন লিখিত পুস্তকের প্রসঙ্গ বিশেষ শোনা যায় না। শুধু শোনা যায়, রঘুনন্দ ভট্টাচার্য মহাশয় বহু বই লিখেছিলেন কিন্তু সে বই এখন আর পাওয়া যায় না। গ্রামের মানুষ রায়গঞ্জ কলেজের অধ্যাপক প্রভাস রায়চৌধুরী মহাশয় পুস্তকের লেখক হিসেবে পরিচিত হয়েছেন সম্প্রতি। সম্প্রতি বরুণ ব্যানার্জি এবং শুভেন্দু দত্ত মহাশয় কবিতা গল্প ইত্যাদি বিষয়ক সংকলন প্রকাশ করেছেন। তা-ছাড়া গ্রামের কৃতী সন্তান হিসেবে কয়েকজনের নামও করা যায় (বিস্তারে দেখা যেতে পারে, কাগ্রাম অমরনাথ মুখার্জি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২৫ বছর পূর্তি স্মরণিকা : Glimpses of Our school history : Laxminarayan Chatterjee)। অন্যতম হলেন শিবনাথ সাহার পুত্র ডাঃ অরূপ সাহা,, প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট, থাকেন আমেরিকায়। গোবিন্দ ব্যানার্জির পুত্র ডাঃ শঙ্কর ব্যানার্জি থাকেন লন্ডনে। প্লাস্টিক সার্জেন হিসেবে তাঁর বেশ সুনাম আছে। অনঙ্গ মোহন পালের কন্যা ড. রীতা পাল হলেন একজন গবেষক রসায়নবিদ, থাকেন জাপানে। ড. অরূপ চ্যাটার্জি হলেন একজন ভূতত্ত্ববিদ। এখন রয়েছেন কানাডায়। আরও একজন ভূতত্ত্ববিদের নাম করা যায়। তিনি হলেন ড. খোন্দেকার জাহাঙ্গীর বর্তমানে দিল্লি জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন।

শুধু পড়াশুনা নয় অন্যান্য বিষয়েও কাগ্রামের মানুষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। যেমন– অশ্বিনী মুখোপাধ্যায়ের পুত্র লক্ষ্মীজনার্দন মুখোপাধ্যায় নাটক করতেন বেতারে। অভিনেতা হিসেবে খ্যাতি আছে তারক মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অস্তি মুখোপাধ্যায়ের। তিনি উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর চোখ ছায়াছবিতে অভিনয় করেছিলেন। অন্য দিকে দেবীপ্রসাদ ব্যানার্জির ছেলে তপন ব্যানার্জি বিশিষ্ট ফুটবলার হিসেবে খ্যাত। মনোমোহন ভদ্রের পুত্র শ্যামচাঁদ ভদ্র হলেন মুর্শিদাবাদ জেলার এ.ডি.এম। তাঁর আরেক ছেলে নিমাই ভদ্র বি.এস.এন.এল-য়ে বিশিষ্ট পদ অলঙ্কৃত করছেন। তা-ছাড়াও অনেকেই কাগ্রামের কৃতী

সন্তান হিসেবে দেশের মুখোজ্জ্বল করছেন সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সময়াভাবে তাঁদের নাম সংগ্রহ করা গেল না।

অতীতে গ্রাম থেকে কোনও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার কোনও খবর নেই। ঊনিশ-শো আশি থেকে তিরাশির মধ্যে আব্দুল নৌসাদ এর সম্পাদনায় এবং প্রবীর মালাকারের উদ্যোগে মাটির ডাকে নামে একটি পত্রিকার তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে বাংলা ১৪১৪ থেকে জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষ্যে বাৎসরিক কঙ্কণ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ১৪ থেকে ১৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সহযোগী হিসেবে অবশ্য অনেকেরই নাম আছে। এবছরের সম্পাদক হচ্ছেন বরুণ সাহা।

জগদ্ধাত্রী পুজো আদি : এ-অঞ্চলে কাগ্রামের নাম মূলত জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য বিশেষ ভাবে খ্যাত। যেমন খ্যাত চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো শোনা যায় এই দুই জায়গায় জগদ্ধাত্রী পুজো প্রচলনের মুলে রয়েছে কৃষ্ণনগরের রাজবংশ। সত্য হোক কিংবা মিথ্যা, কিংবদন্তি এরকমের।

সিরাজোদৌলার পতন হয়ে গেছে। ইংরেজের কৃপায় কখনও মিরজাফর আবার কখনও মিরকাসেম বাংলার মসনদে বসেছেন ঠিকই কিন্তু ঘটনাচক্রে আবার ওই ইংরেজদের বিরুদ্ধেই মিরকাসেমকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হচ্ছে। ইংরেজপ্রেমী কৃষ্ণনগরের তৎকালিন রাজা মৃঙ্গের দুর্গে বন্দি হন। বুদ্ধিবলে তাঁরা ছাড়া পেলেও দুর্গাপুজোর আগে বাড়ি ফিরতে পারেন না। রাতে স্বপ্নে দেখেন, চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী, রক্তাম্বর পরিহিতা, এক দেবী শ্বেত নরসিংহে যোদ্ধার মতো বসে রয়েছেন। তাঁর চার হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, ধনু, ও বান। তিনি যেন আদেশ করছেন সামনের শুক্লা নবমীতে তাঁর পুজোর ব্যবস্থা করতে। তাতে দুর্গাপুজোর মতো ফললাভ হবে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেমতো প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজো চালু করেন। কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত বইতে লিখেছেন– রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পুজোর প্রচলন করেন। অনেকে অবশ্য শাস্ত্রে লেখা দেখিয়ে প্রমাণ করেন যে শাস্ত্রীয় জগদ্ধাত্রী দেবীর পুজো বহু প্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের দুশো বছর আগে হলেন স্মার্ত রঘুনন্দন। রঘুনন্দনেরও দুশো বছর আগে অর্থাৎ চতুর্দশ শতকে মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি তাঁর ব্রতকালবিবেক গ্রন্থে জগদ্ধাত্রী সম্পর্কে শ্লোক রচনা করে গেছেন, খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ/ ষোড়শ শতকে আচার্য শ্রীনাথ চূড়ামণি কৃত্যন্তওত্ত্বার্ণব গ্রন্থে জগদ্ধাত্রীর কথা উল্লেক করেছেন এবং ১১৭২ বঙ্গাব্দে পন্ডিত শরণদেবও চন্ডীটীকাতে জগদ্ধাত্রীর কথা বলেছেন। পাল যুগে হিন্দুও বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রবল প্রভাব ছিল। ওই শাস্ত্রসমূহে জগদ্ধাত্রীর উল্লেখ আছে একথা বলেছেন পন্ডিত ভান্ডারকর।[১৩] কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের (খ্রিস্ট্রীয়পঞ্চদশ শতক) তন্ত্রসার গ্রন্থে জগদ্ধাত্রীর ধ্যান আছে। কেনো পনিষদে হৈমবতী জগদ্ধাত্রীর কথা আছে।[১৪] কাজেই জগদ্ধাত্রী পূজা প্রবর্তনে শুধু কৃষ্ণচন্দ্রকেই গুরুত্ব দেওয়া যায় না। কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত জগদ্ধাত্রী পুজোর সংখ্যা চন্দননগরের চেয়ে বেশ বেশি।

কৃষ্ণনগরে পুজো প্রচলনের যেমন একটা ইতিহাস রয়েছে, ঠিক এমনই একটি কাহিনি রয়েছে চন্দননগরের বেলায়।...চন্দননগরে এক বর্ষীয়ান নাগরিকের কথা অনুসারে কৃষ্ণনগর থেকে প্রায়শ চাল ব্যবসায়ীরা চন্দননগরে চাল কিনতে আসতেন। একবার ঘটনা চক্রে তাঁরা পুজোর আগে কৃষ্ণনগর ফিরতে পারেননি কাজেই পুজো দেখা তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি। তখন তাঁরা চালপট্টিতে জগদ্ধাত্রী পুজোর ব্যবস্থা করেন। সময়কাল মোটামুটি ১৭৩০ থেকে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ।[১৫] সেথেকেই চন্দননগরে জগদ্ধাত্রীর পুজোর প্রচলন হল। কালনা বৈদ্যপুরের মিরহাট গ্রামে প্রায় দুশো বছরের বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পুজোর অস্তিত্ব আছে। হুগলি জেলার সোমড়া গ্রামে স্থায়ী মন্দির আছে এবং অষ্টধাতুর জগদ্ধাত্রী নিত্যসেবা পান। প্রতিষ্ঠা-কাল ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দ। এই দেবীর কোনও বাহন নেই। আনুমানিক চতুর্দশ শতকের প্রস্তরময়ী জগদ্ধাত্রী মূর্তি রয়েছে আশুতোষ মিউজিয়মে। টেরাকোটায় জগদ্ধাত্রী অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। যেমন– হেতমপুর ও নানুরের শিবমন্দিরে। ইলামবাজারের দেউলে, বর্ধমানের মিত্রকুড়ি গ্রামে দ্বাদশ শিব মন্দিরে। উল্লেখ্য কাটোয়া-দাঁইহাটের বাগটিকরা মন্দিরের টেরাকোটায় জগদ্ধাত্রীর মূর্তি বিশেষ ব্যঞ্জনাময়ী এবং চরম বেগবতী। এরকমের মূর্তি বিরল।[১৬] কিন্তু কাগ্রামে?

সেখানেও সেরকমের একটিগল্প আছে।– বলা বাহুল্য কাগ্রামের মহাশয় বংশীয়েরা সত্যই মহাশয় অর্থাৎ তাঁরা অত্যন্ত সম্মাননীয় নাগরিক। তাঁদের আদি বাড়ি ছিল কেতুগ্রামের ধান্দলসা বেণীনগর। মাতুলালয় সূত্রে কাগ্রামে বসতি স্থাপন করেন নন্দলাল বিদ্যাভূষণ মহাশয়। তাঁর ছেলে গৌরীশংকরের বৃত্তি ছিল পুরোহিতগিরি। তিনি কৃষ্ণনগরে গিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজো দেখে এসে ভাই সারদাচরণের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ভাইদের মতামত নিয়ে কাগ্রামে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রথম প্রচলন হয়। সেসময় কৃষ্ণনগরের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন মহারাজা গিরীশচন্দ্র রায় (১৮০২-১৮৪১ইং)। মোটামুটি তিন জায়গায় জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষ্যে ধুম হয় তা জানা গেল। কিন্তু জানা হল না তিন জায়গার পুজোর মধ্যে পার্থক্য কিছু আছে কিনা। কৃষ্ণনগর এবং কাগ্রামের পুজো একদিনের। কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথির দিন সকালে সপ্তমী, দুপুরে অষ্টমী ও বৈকালে নবমী পুজো। পরের দিন ও দশমী চারদিনের পুজো। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির পুজোর সিংহ ঘোড়ার মতো দেখতে হলেও তাকে শাস্ত্রমতে নরসিংহ বলে। কিন্তু চন্দননগর বা কাগ্রামের জগদ্ধাত্রী মূর্তির সিংহ আফ্রিকান সিংহের অনুরূপ এবং বেদিতে একাধিক থাকতে পারে। আফ্রিকান লায়ন শব্দটি নিয়ে কাগ্রাম প্রসঙ্গে প্রয়াত সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ বলেন– আফ্রিকান লায়ন আকারে বড়ো হয় মাত্র এই যা। কেশর সব সিংহেরই থাকে সিংহীর থাকে না। বারোয়ারির বেলায় সেসব বালাই নেই, সিংহের সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, অসুর আদি থাকে। হুগলি এবং নদিয়া জেলায় শুধু

সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী আর বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদে দেবীর দুপাশে মুনি, ঋষি, ব্রহ্মা, শিব, জয়া, বিজয়া আদি থাকতে দেখা যায়।

গত কয়েক বছর ধরে কাগ্রামে পারিবারিক ও বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পুজোর সংখ্যা ঊনিশে এসে দাঁড়িয়েছে। সঠিক প্রতিষ্ঠাকালের নজির প্রায়শ অনুপস্থিত, মৌখিক-তথ্যটুকুই হল সার। পুজোর ক'দিন গ্রামবাসীরা আনন্দে বিভোর হয়ে থাকেন। আনন্দের উপকরণের বিবরণে নতুন আর কিউ বা থাকতে পারে। ওই প্যান্ডেলে বাহারি কারিকুটি, আলোক সজ্জায় রঙ বাহার, ঢাক ঢোলের আতিশয্য, প্রচুর বাদ্য-যন্ত্রের সমাহার, গোটা গ্রামে প্রায় হাজার খানেক ঢাকের দৌরাত্ম্য, কান পাতা দায়। তাতেই সব মহা খুশি। তা-ছাড়া আর যা কিছু থাকতে পারে তা বৈশিষ্ট্যসহ সংক্ষিপ্তসার হল এরকমের।

১। মহাশয় বা মশাই বাড়ির পুজো : ১২২৭ বাংলা সালে সারদাভূষণ গৌরীশঙ্কর ও কনিষ্ঠ ভাই ত্রৈলোক্যনাথকে নিয়ে পুজোর প্রচলন করেন। কিংবদন্তি অবশ্য অন্যকথা বলে। অখিলনাথ মহাশয়ের স্ত্রী সারদাসুন্দরী দেবী তাল পুকুরে স্নান করে বাড়ি ফিরছিলেন। একটি কুমারী মেয়ে তাঁর কাছে জল খেতে চান। তিনি তাকে বাড়ি আসতে বলেন। বাড়ি ঢোকার আগেই মেয়েটি অন্তর্হিত হয়। রাতে স্বপ্নে মেয়েটি তাঁর পুজো দিতে বলেন। তা-থেকে পুজোর প্রচলন। দেবীর নামে কোনও চাকরান সম্পত্তি নেই। পাকা মন্দির তৈরি হয়েছে ১৩৭১ বাংলা সালে। এখানেই একমাত্র মোষ বলি হয়। মেয়েরা সিঁদুরও খেলে। রাতে বাউল, যাত্রাগান বিচিত্রানুষ্ঠানের আসর জমে ইত্যাদি।

২। রক্ষাকর রায়চৌধুরীর পুজো : ১৩২১ বঙ্গাব্দে রক্ষাকর রায়চৌধুরী এই পুজোর প্রচলন করেন। রক্ষাকরবাবু যখন নাবালক ছিলেন তখন পারিবারিক অন্নপূর্ণা পুজো চলাকালীন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়, অন্নপূর্ণা পুজো করা সম্ভব হয় না। তাই তিনি জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন করেন। পাকা মন্দির আছে। বলিদান হয়। চাকরান সম্পত্তি ছিল, এখন বেদখল। দেবস্থানের সামিয়ানায় উড়িষ্যার শিল্প শোভা বাড়ায়। ঘটনাচক্রে রায়চৌধুরী বাড়ির এই পুজো দৌহিত্র বংশের সন্তান তরুণ ব্যানার্জি পরিচালনা করেন। রাতে কোনও অনুষ্ঠান হয় না। পারিবারিক পুজো বলে আধ্যাত্মিক দিকটা যতটা জোরালো আড়ম্বরটা ততটাই কম।

৩। ব্রহ্মপদ রায়চৌধুরীর পুজো : জমিদার সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর মা রাধারানি দেবীর আমল থেকে পুজো আরম্ভ। ঠাকুরের কোনও দেবোত্তর সম্মপ্তি নেই। তাঁদের মতানুসারে জমিদার বাড়ির এই পুজোটি ১৩৩ বছরে পড়ল। পাকা মন্দির আছে। তাঁদের কুলদেবী প্রস্তরময়ী মা-তারা পুজোর সময় জগদ্ধাত্রী অঙ্গনে উপস্থিত থাকেন এবং পুজো পান। এখানে পশুবলি বন্ধ হয়ে গেছে। বাজেট ৫০ হাজার টাকা মতো। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও বন্ধ। বর্তমানে পুজোর পরিচালক হলেন অরুণাংশু এবং দেবাংশু রায়চৌধুরী।

৪। সাত আনা মন্ডপের পুজো : কাগ্রামের চৌধুরী বংশের জমিদারি ক্রমে দুটি অংশে ভাগ হয়ে যায়। ব্রহ্মপদ রায়চৌধুরী সূত্রে নয় আনা অংশে উত্তরসূরি হলেন দেবাংশু রায়চৌধুরী আর রক্ষাকর রায়চৌধুরীর দৌহিত্র সূত্রে বর্তমান সাত আনার উত্তর সূরি হলেন ব্যানার্জি ও চ্যাটার্জি বংশ।

বিমল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের জেঠিমা বসন্তকুমারী দেবী এই পুজোর পত্তন করেন ১২৫ বছর আগে। ৬ বিঘা মতো দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। এখন সেটি শরিকী পুজোর চেহারা নিয়েছে, বাজেট হাজার পঞ্চাশ টাকা। মন্দিরের পাশে পঞ্চমুন্ডির আসন আছে। এই পুজো একটি ব্যতিক্রমী পুজো। অতীতে জগদ্ধাত্রী দেবী বাঘের পিঠে অধিষ্ঠান করতেন। এখন মূর্তির দু-পাশে দুই জন মুনি ও ঋষির অধিষ্ঠান। মূল ব্যবস্থাপক হলেন শ্রীউজ্জ্বল চ্যাটার্জি। দেবীস্থানে প্রায় পাঁচ ছ'রকমের বাজনা থাকে। মূলত দেশি বাজনা। যেমন– ঢাকা গোটা পঁচিশেক, ব্যাগ-পাইপ, ঢোল, দগড়, তাসাপার্টি ইত্যাদি, দুর্গা পুজোর সময় শুধু সাত আনা বাড়িতেই মোষ বলি হয়।

৫। উত্তর পাড়া ব্যানার্জিদের পুজো : পুজোটি প্রাচীন বলেই হয়ত দেবীর নাম বুড়িমা। তাঁদের আরও দাবি নদিয়া জেলার বেলপুকুর গ্রাম থেকে এই দেবী কাগ্রামে আসেন। আগে প্রচুর মেষ ও ছাগবলি হত। মূর্তির দুপাশে জয় এবং বিজয়া রয়েছেন। অন্যতম শরিক দেবকুমার ব্যানার্জির মতে প্রায় সাড়ে তিন-শো বছর আগে পুজো প্রথম প্রবর্তিত হয়। বলা বাহুল্য এই দাবি কৃষ্ণচন্দ্রের কালকে (১৭২৮-৮২) প্রায় এক-শো বছর ছাপিয়ে যায়।

৬। গোপেশ্বর ব্যানার্জির পুজো : প্রচলিত নাম পিলেউলির পুজো। বয়স মোটামুটি পঞ্চাশ বছর। অনুমান প্রতিষ্ঠাত্রী নাকি পিলে (বর্ধমান জেলার পিলে-পাটুলি) গ্রাম থেকে এসেছিলেন বলে নাম এরকম। তাঁর কন্যা মাখনবালা সাহা ননী গোপাল ব্যানার্জিকে ভিক্ষে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেন। পুজোর প্রচলন হয়েছিল তাঁর দ্বারাই পাকা মন্দির আছে।

৭। ঘটক পাড়ার ব্যানার্জি বাড়ির পুজো : মোটামুটি চার পুরুষের। বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রস্তরময়ী তারামাকে জমিদার বাড়ি থেকে শোভাযাত্রা সহকারে জগদ্ধাত্রী মন্ডপে নিয়ে আসা হয়। নানা রকমের বাজনা ও রঙিন শোভাযাত্রা নিঃসন্দেহে দর্শনীয় উদ্যোগ।

৮। দে বাড়ির পুজো : সিঙ্গিবুড়ি নামে এক বৃদ্ধা এই পুজোর প্রচলন করেন বলে কথিত। অতীতে মূর্তি পুজো হত এখন পুটে পুজো। চার পুরুষ আগে পুজো -প্রবর্তনের ব্যাপারে ফকির দে মশায়ের যথেষ্ট অবদান ছিল।

৯। মিস্ত্রিবাড়ির স্বপ্নাদিষ্ট পুজো, চারপুরুষের। বিহারী লাল মিস্ত্রি হলেন প্রতিষ্ঠাতা। দেবীর গায়ে রঙ উদীয়মান সূর্যের মতো।

১০। পালবাড়ির পুজো : অনেকের মতে প্রতিষ্ঠাতা : গোপাল পাল ও ক্ষিরোদ সিংহ। মোটামুটি ৩৮ বছর পদার্পণ। আগে কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা আনা হত বলে সকলের আগ্রহ থাকত এই পুজো দেখার। বাজেট প্রায় দেড় লাখ টাকা। পাকা মন্দির তৈরি হয়েছে। বৈশিষ্ট্য, ঢাক-ঢোল, তাসাপার্টি, ব্যাঞ্জোপার্টি ছাড়াও নবমীতে কুমারী পুজো, আতসবাজির খেলা আর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

১১। শিবনারায়ণ সাহার পুজো, বয়স কমবেশি ৫০ বছর। মহাদেব সাহা এবং শিবনারায়ণ সাহা এই পুজো কালীমতি দাসীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে শুরু করেন। এখন শিল্পসমৃদ্ধি পাকা মন্দির রয়েছে। বাজেট প্রায় এক লক্ষ টাকা।

১২। রায়পাড়া বারোয়ারি : শম্ভুনাথ রায় প্রতিষ্ঠাতা, এখানেও প্রাচীনত্বের দাবি তিন-শো বছর। পরবর্তীকালে এটি সার্বজনীন পুজোয় পরিণত হয় ফলে নির্দিষ্ঠ কোনও ব্যক্তি বিশেষের নামে সংকল্প হয়া। ছাগবলির বদলে এখন চালকুমড়ো বলি। বাজেট এখন এক লক্ষ টাকার মতো। দেবীর নামে বিঘে দুই জমি আছে। ঢাক, ঢোল, সানাই, তাসা, ব্যাঞ্জো, দগড়, ডি.জে., আদি বাজনায় মন্ডপ মুখরিতা। কোলকাতা থেকে যাত্রার দলও আমদানি করা হয়।

১৩। বাজারপাড়া সার্বজনীন : ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ থেকে পুজো শুভ সূচনা। যেহেতু পুজো মন্ডপ হল বাজারে সেহেতু সেখানে প্রচুর জনসমাগম। আড়ম্বরও যথেষ্ট। নানা রকমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাউল ও করিগান বেশ জনপ্রিয়। বাজেট দেড় লক্ষের কাছাকাছি, এবারকার সম্পাদক শ্রীঅরুণ সাহা।

১৪। উত্তর পাড়া সার্বজনীন : ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে পুজোর পত্তন। ইচ্ছাময়ী মন্দির সংলগ্ন মন্দিরে দেবীর পুজো হয় বলে দেবী ইচ্ছাময়ী নামেও খ্যাত। সাধারণত তিন চার বছর অন্তর দেবী স্বপ্ন দেন। সে-অনুসারে বিশেষ ধূমধামের সঙ্গে পুজো হয়। বিশেষভাবে মচ্ছবের আয়োজন থাকে। সাধারণ পুজোর বাজেট দেড় লক্ষ। বলা বাহুল্য বিশেষ পুজোর সময় বাজেট দেড়ে সামলায় না। বাজানা প্রায় আট রকমের। কবি ও যাত্রা গানের আসর মেতে ওঠে। বিসর্জন শুরু হয় রাত্রি দশটায় আর শেষ পরের দিন সকাল দশটায়।

১৫। মধ্য পশ্চিমপাড়া বারোয়ারি : ছত্রিশ বছরের পুজো। বাজেট এবছরে ৮৫ হাজার টাকার মতো। উদ্যোক্তাগণ হলেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ, চন্দ্রমোহন ঘোষ প্রমুখ। খ্যাতনামা শিল্পীদের বাউল গান ও যন্ত্র সঙ্গীতে আসর মুখর হয়ে ওঠে। পুজোর বাজনা হল—ঢাক, ঢোল, সানাই, তাহা, ব্যাঞ্জো, দগড়, ডিজে., আদি। আলোকসজ্জা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এতদ্‌সত্ত্বেও কোনও শোভাযাত্রার ব্যবস্থা থাকে না। ব্যতিক্রম নিঃসন্দেহে।

১৬। তাঁতিপাড়া বারোয়ারি : ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ থেকে পুজোর প্রচলন। প্রতিষ্ঠাতা হৃদয় চক্রবর্তী ও যুবসম্প্রদায়। আয়োজকদের অধিকাংশ শ্রমজীবী হলেও দেবীপূজার আয়োজনে কোনও ঘাটতি থাকে না। বাউল গানের বাহুল্য চোখে পড়ার মতো। বাজেট এক লক্ষ ত্রিশ হাজার।

১৭। পশ্চিমপাড়া সার্বজনীন : দাবি, এক-শো দশ বছরের প্রাচীন, প্রতিষ্ঠাতা হরিপদ দত্ত। মন্দিরের জায়গাটি ভূষণচন্দ্র দত্তের কন্যা ওয়ারিশ সুত্রে পেয়ে দান করেন। প্রথমে মাটির মন্দির ছিল পরে পাকা। পারিবারিক পুজো থেকে ক্রমে সার্বজনীন। প্রতিমার বর্ণ উদীয়মান সূর্যের মতো, ডাকের সাজ, সুপাশে রয়েছেন মুনি-ঋষি। বাজেট প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। সারা রাত্রি ব্যাপী যাত্রাগান, বাউল বা ফকিরি গান, আতসবাজি, লাঠি খেলা ইত্যাদির কসরতে দর্শক ও শ্রোতারা মুগ্ধ।

১৮। পূর্ব সাহা পাড়া সার্বজনীন : ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে পুজো শুরু। প্যান্ডেল এবং আলোক-সজ্জা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নতুন করে পুজোর প্রতিষ্ঠা মানুষের ইচ্ছের অদম্যতা প্রকাশ করে।

১৯। দক্ষিণ পাড়া সার্বজনীন : অমল কুমার রায়, নকড়ি মন্ডল হলেন উদ্যোগী। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। বাজেট দেড় লক্ষ টাকা প্রায়।

গ্রাম বাংলার প্রতিটি বড়ো উৎসবের যা চরিত্র কাগ্রামের জগদ্ধাত্রী পুজোও তার ব্যতিক্রম নয়। শহরীয় সভ্যতার নজির হিসেবে চন্দননগরে আলোক কারসাজি দেখিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা থাকে আর থাকে বিরাট বিরাট মাপের জগদ্ধাত্রীদেবী। কেউ যদি প্রশ্ন তোলেন যে দেহের আনুপাতিক মাপ ঠিক থাকে কিনা, তার উত্তরে না বলাই বুঝি ভালো। উচ্চতার ওই মূল্যায়ন শিল্পের মর্যাদাকে অস্বীকার করে। সে-জায়গায় কাগ্রামের উৎসবে দেবীর মাপজোপ স্বাভাবিক, বিদ্যুতের বাহার তুলনা মূলক ভাবে কম থাকলেও চন্দননগরের কাছাকাছি প্রায়। একটি মন্ডপের আলোকমালা সজ্জিত তোরণ অপর পাড়ার মন্ডপ পর্যন্ত বিস্তৃত। তারস্বরে বৈদ্যুতিন চোঙের চিৎকার, কানের পর্দা টিকিয়ে রাখাটাই দায়। তাতেও মন ভরে না সকলের। ঝোঁক পড়ে কর্ণবিদারক ঢাক-ঢোলের আওয়াজের উপর। এক একটি মন্ডপে কমবেশি সত্তর আশিটি ঢাক অনবরত বাজতে থাকে, সঙ্গে থাকে ঢোল ও ছয় সাত রকমের বাজনা-দলের লম্ফঝম্ফ উসকানি। সে-এক এলাহি কান্ড। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকেও কোনও কথা বুঝিয়ে বলতে যায় না, ইশারায় কাজ সারতে হয়।

এখানেই শেষ নয়। বাজনা থাকলেই হল না, প্রতিযোগিতা না হলে তো কিছুই হয় না। অতএব ওই দলবল নিয়ে চলে দুপুরে-মাতন। তার মানে ভয়ঙ্কর শব্দের ওঠা-নামা সহ সম্ভভত অপ্রকৃতিস্থ মানুষদের বেতাল নৃত্য নিয়ে শোভাযাত্রা। গ্রাম পরিক্রমায় নৃত্যপটিয়সী মহিলারাও পিছিয়ে থাকেন না। সব মিলিয়ে উৎসবের এতবেশি হাতছানি যে বাইরে থেকে হাজার হাজার মানুষ আসেন ওই গ্রামে। প্রতিটি পরিবার ভরে ওঠে দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবে। চাকরি-বাকরি

সূত্রে যাঁরা বাইরে থাকেন তাঁদের সিংহভাগ এই পুজোর সময় গ্রামে ফিরে আসেন। একটা মিলনোৎসবের রূপ নেয়। বাড়িতে বাড়িতে তাই তৈরি হয় নানা রকমের আহার্য-বস্তু।

পুজো ও বিসর্জনের দিন গোটা গ্রামের রাস্তাতেই কার্যত ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা রকমের দোকানপাট বসে। তবে মূল মেলা বসে মহাশয় পাড়ায়। শোনা যায়, কোনও কোনও দোকানে গোপনে বিক্রি হয় উত্তেজক পানীয়। বিসর্জনের দিন কান-ফাটা বাদ্যবাদ্যি, বাজিপটকা নিয়ে চলে দেবী প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা। উদ্দেশ্য গ্রাম-পরিক্রমা। কিন্তু চলার গতি থাকে তেল মাখা বাঁশে বাঁদরের ওঠার নামার মতো। এক-পা এগোয় তো দু-পা পিছোয়। কোথাও শোভাযাত্রা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, এগোনোর উপায় থাকে না। সারারাত শেষ হয়ে যায়, কিন্তু শোভাযাত্রা আর থামে না। পরের দিন লো দশঠা এগারোটা পর্যন্ত চলে বিসর্জন পর্ব। স্বভাবতই শান্তি রক্ষার্থে পুলিশ প্রশাসনকে ওই ক'দিন অত্যন্ত সচেতন থাকতে হয়, প্রচুর পুলিশ মোতায়েন থাকেন সারা গ্রামে। অস্থায়ী স্বাস্থ্যশিবির বসে। বলা বাহুল্য, কাগ্রামের জগদ্ধাত্রী পুজো এ-অঞ্চলের একটি উলেখযোগ্য পুজো। মানুষ সারাবছর ওই কটি দিনের জন্য অপেক্ষায় থাকেন। মোটমুটি এই হল কাগ্রামের জগদ্ধাত্রী পুজোর বিবরণ। এবার স্থায়ী ধর্মস্থানের কথা বলা যেতে পারে।

ধর্মস্থান : গ্রামে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ। তাঁরাই শুধু নানা, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের পিরের আস্থানায় সমবেত হন, এটা জানা কথা। কাগ্রামে এরকমের খ্যাতনামা পিরের আস্থানা রয়েছে অন্তত গোটা চারেক।

১। বুডো পির তারমধ্যে খোন্দেকার বংশের প্রথম পুরুষ। বিশ্বাস–বুড়ো পির বা শাহ আব্দুল কুদ্দুস পিরজাদা, হলেন প্রাচীনতম। তাঁকে ঘিরে অনেক কিংবদন্তি, যেমন– কোনও কোনও সময় তাঁর আস্তানার চারদিকে বাঘের আনাগোনা দেখা যেত, ঘোড়ার খুরের শব্দও পাওয়া যেত রাতে, সেকারণে কুকুর বা ফেউ লাগত পিছে। শোনা যায় তাঁর এরকমের কুদরতে সম্রাট ঔরঙ্গজেবও নাকি বিস্মিত হয়ে পড়তেন। প্রথমে পিরসাহে এসে একটি গর্ত ছিল। সে-গর্ত কেউ কোনও দিন ভরাট করতে পারেননি। সে-জায়গা ছেড়ে তিনি চবুতরা পাড়ার কাছে মোকামপুর পাড়ে তেঁতুলতলায় আস্তানা গাড়ে। পরবর্তীতে অবশ্য এই দুই জায়গার মধ্যেই তাঁর আনাগোনা বজায় থাকে।

২। আলখাল্লা পরিহিত আরেক পিরের কথা শোনা যায়। তিনি বহড়া রি শাহজালাল তলার আস্তানাতে আশ্রয় নিতেন।

৩। খানসামা পাড়া আস্তানা : ইমামতলার প্রাচীন বটগাছ তলায় এই আস্তানা। পিরের নাম প্রচার নেই কিন্তু প্রতি সন্ধেতে ধূপকাঠি ও বাতি দেওয়া হয়। আর গাছের কোটরে রাখা হয় মাটির ঘোড়া। মনোবাঞ্ছা পূরণের অভিপ্রায়ে চৈত্র মাসে চাদর জড়ানো হল। মেলা বসে সেসময়। এর বেশি কোনও তথ্য পাওয়া যায় না।

৪। আসনতলার প্রাচীন নিমগাছ তলাতেও এক অজ্ঞাত পিরবাবার আস্তানা আছে। বলে শোনা যায়।

মসজিদ : গ্রামে বর্তমানে রয়েছে চারটি মসজিদ। তারমধ্যে কাগ্রাম বড়ো মসজিদ সবচেয়ে প্রাচীন, ১৯২০ সালে মাটির ঘর দিয়ে যাত্রা শুরু। এখন গম্বুজওয়ালা দুতলা পাকা অট্টালিকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রামের অভিজাত জমিদার মরহুম খাজা রফিউদ্দিন আহমেদ সাহেবের বংশধরেরা ওই মসজিদটির পরিচালন দায়িত্ব বহন করেন। মূলত এই মসজিদ কমিটির উদ্যোগে পূর্বমাঠে একটি বড়ো ইদগাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জায়গাটির স্থান সংগ্রহে ব্রহ্মপদবাবুর অবদান ছিল বলে শোনা যায়।

ঢালিপাড়া মসজিদ : প্রাক্ স্বাধীনতা কালে এই মসজিদটি ছিল মাটির তৈরি। বর্তমানে মসজিদটি শুধু পাকাই নয় তার মেঝেতে বসেছে মার্বেল। তা-ছাড়া রয়েছে জলের ভান্ডার, শৌচাগার, ধান-রাখার গোলা ইত্যাদি। মসজিদের জমির পরিমাণও বেশ বেড়েছে। বলা বাহুল্য প্রচুর নামাজি জমায়েত হন সেখানে।

মিরপাড়া মসজিদ : কাগ্রামের একেবারে পূর্বপ্রান্তে এই মসজিদটি রয়েছে। প্রথমে একটি মাটির ক্লাবঘরে এটির শুরু তারপর পাড়ার মানুষের অনুদান ও আদায়কৃত ধানের মূল্য থেকে দোতলা পাকা অট্টালিকা তৈরি করা হয়েছে। মসজিদের পরিচালনায় তবলিক জামাত্ নামক একটি ধর্মীয় শিক্ষা সূচিও চালু আছে এখানে।

নুরানি মসজিদ : শুরুতে গ্রামের মাঠপাড়ার দক্ষিণ প্রান্তে হাই স্কুলের কাছে মাটির ঘরে মসজিদের সূচনা। ক্রমশ বেশি পরিমাণে জমির দরকার পড়ে। সে জমিও সংগৃহীত হয়। ১৪১০ বঙ্গাব্দে সকলের শুভেচ্ছায় তৈরি হয় পাকা মসজিদ। এখন বহু ধর্মপ্রাণ মানুষের জমায়েত হয় সেখানে।

তা ছাড়া কাগ্রামে নানান্ দেবদেবীর মন্দির রয়েছে। যেমন–

শাঁখারি পাড়ার ভদ্রদের নারায়ণ মন্দির : বর্তমান মন্দিরের উত্তর পূর্বদিকে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তা দেখে সাধারণভাবে অনুমান করা যায় যে ওই মন্দির শ-দুয়েক বছরের প্রাচীন। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২রা কার্তিক নতুন মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। নির্মাণ করেছেন লক্ষ্মীকান্ত ভদ্র। মন্দিরের গর্ভগৃহে কোনও প্রতিমা নেই। নারায়ণ, সূর্যদেব ও লক্ষ্মীজনার্দন নামে রয়েছেন তিনটি শালগ্রাম শিলা। কথিত আছে কোনও বৈষ্ণব সাধক গন্ডক নদী থেকে ওই শালগ্রাম শিলাগুলি সংগ্রহ করেন। বৈশাখী সংক্রান্তি ও জন্মাষ্টমীতে ধূমধামের সঙ্গে উৎসব পালিত হয়।

রাজপাড়ায় লক্ষ্মীজনার্দন জিউ মন্দির : অতীতে মাটির মন্দিরে শালগ্রাম শিলা পূজিত হতেন। শ্রীকান্তভূষণ দত্ত

১৩৫৪ বঙ্গাব্দে ৯ই কার্তিক বর্তমানে পাকা মন্দিরটি তৈরি করিয়েছেন। বৈশাখ মাসে সংক্রান্তিতে কল্যাণপুরগামী হরিনামের দলগুলিকে এই মন্দির আবাহন করে জলযোগ করানো হয়। তা-ছাড়া জন্মাষ্টমীতে রয়েছে পংক্তি-ভোজ।

রায়পাড়ার শ্রীধর জিউ মন্দির : আগে এখানে কুলদেবী গন্ধেশ্বরীর মন্দির ছিল। ক্রমে গন্ধেশ্বরী পুজো বন্ধ হয়ে যায়। মন্দির ভেঙে পড়ে। সেই মন্দিরের ভিতেই তৈরি হয় বর্তমানের মন্দির। বাসন ব্যবসায়ী কুড়ারাম নন্দন শ-দেড়েক বছর আগে শ্রীধর জিউ শালগ্রাম শিলাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নদিয়া জেলার কোনও এক গ্রাম থেকে নিয়ে আসে। তখন এই মন্দির তৈরি হয়নি। কাজেই দক্ষিণপাড়ার ব্যানার্জিদের নারায়ণ মন্দিরে শ্রীধর জিউও পূজিত হতেন। কালক্রমে সন্তোষ নন্দন ধর্মরাজ মন্দিরের পূর্ব দিকে এই নতুন মন্দিরটি নির্মাণ করেন এবং ঘটা করে শ্রীধর জিউকে এখানে নিয়ে আসা হয়। জন্মাষ্টমীতে পুজোর খুব ধুমধাম হয়।

রায়পাড়ার নারায়ণ মন্দির : দ্বিজপদ রায়ের ভাই-পো কাশীনাথ রায় ১৩৯২ বঙ্গাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। পাশেই পড়ে রয়েছে রামনারায়ণ রায় প্রতিষ্ঠিত কয়েক শো বছরের পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। নতুন মন্দিরের গর্ভগৃহে বিরাজ করছেন শালগ্রামরূপী নারায়ণ। রাসে আর পঞ্চম দোলে বেশ ধুমধাম হয়। অনেকে নারায়ণের দেহ নির্গত মানিকছটা লক্ষ করেছেন বলে কথিত আছে।

রায়বাড়ির মন্দির প্রাঙ্গণে অবশিষ্ট জোড়া শিব মন্দির দুটি অত্যন্ত প্রাচীন বলে ধারণা। কথিত আছে রায় পরিবারের জনৈক সদস্য কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে কর্মরত ছিলেন। সেখানকার মন্দির দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি উড়িষ্যা থেকে রাজমিস্ত্রি এনে মন্দির দুটি তৈরি করান। শিবলিঙ্গ কাশী থেকে আনা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।

দক্ষিণপাড়ার দুর্গামন্দিরের পশ্চিমপ্রান্তে চুড়াবিশিষ্ট শিবমন্দির : কথিত আছে, শশধর ব্যানার্জির পূর্ব পুরুষেরা এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি। আগে সেখানে জগদ্ধাত্রী পুজো হত। পাড়ায় চ্যাটার্জিরা এই মন্দিরটি সংস্কার করেছেন।

দক্ষিণপাড়ার ধ্রুব চ্যাটার্জির বাড়ি লাগোয়া প্রাচীন চূড়াবিশিষ্ট শিব মন্দির : মন্দিরের সামনের বেদিটি তৈরি করেছেন শিক্ষক তারকনাথ ব্যানার্জির পিতা। এগুলি ছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর বাড়ির সামনে (সাতনবাবু) আরও দুটি চূড়া বিশিষ্ট শিব মন্দির গ্রামের শোভা বর্ধন করছে।

দক্ষিণপাড়া সাতআনা মন্ডপের কাছে লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের মন্দির : আনুমানিক পাঁচ শো বছর আগে এই মন্দিরটি নির্মিত হয় বলে ধারণা। গর্ভগৃহে অনেকগুলি ঠাকুরের অধিষ্ঠান রয়েছে যথা লক্ষ্মীনারায়ণ, শ্যামসুন্দর, রাধারানি ভুবনেশ্বরী, যন্ত্রকালী, জয়দুর্গা ও সূর্যদেব। প্রতি বছর দোল এখানের আকর্ষণীয় উৎসব। জন্মাষ্টমী ও বৈশাখী সংক্রান্তির উৎসব কম যায় না।

মহাশয় পাড়ার বুড়ো শিব মন্দির : মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রহ্মঠাকরুণ। এখানে কালিন্দি ও বুড়োশিব লিঙ্গ ছাড়াও আরও একটি স্বতন্ত্র শিবলিঙ্গ রয়েছে। ওটি প্রতিষ্ঠা করেন কমল ঠাকরুণ। বুড়ো শিব ও কালিন্দিকে ধানের ব্যবসায়ীরা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে গঙ্গাপার থেকে বয়ে এনেছিলেন। গ্রামের লোকেদের শাসনতলা হল এই মন্দির। গাজনের সময় ২৮ শে চৈত্র শিবলিঙ্গ দুটিকে মশাল জ্বালিয়ে বাজারের সাত আনা অংশের মন্ডপে নিয়ে যাওয়া হয়। থাকেন আড়াই দিন। ১লা বৈশাখ হল লিঙ্গদ্বয়ের রাজবেশের দিন। বলা বাহুল্য তখন বোলান গানও হয়।

কঙ্কচন্ডী বা কানাই চন্ডী : বহুবার আলোচিত হয়েছে যে কাগ্রাম এসেছে কঙ্কচন্ডী থেকে। এই গ্রামদেবী বলা বাহুল্য প্রাচীনতমা হিসেবে বিবেচিত। উত্তর পাড়ার নান্দনিক সংস্থার কাছে বর্তমানে রয়েছে কানাই চন্ডীর দক্ষিণ-দুয়ারি সমতল ছাদের দু-কামরার মন্দির। সামনে রেলিং-ঘেরা বারান্দা, বেশ উচুঁ। দর্মশ-তলা বা সুধীরবাবুর মোড় থেকে উত্তর দিকে এগোলেই এই মন্দির দেখা যায়। সম্প্রতি পুরোনো ভাঙা মন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছে। বলা বাহুল্য দেবী চন্ডীর কোনও মূর্তি নেই। দেখা যায়, গর্ভ গৃহে গামছা-বাঁধা মাটির দুটি হাঁড়িকেই কঙ্কচন্ডীর প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। দুই হাঁড়ির মাঝখানের রয়েছেন মঙ্গলচন্ডী। দুর্গাপুজোর দশমীর দিন কানাইচন্ডীকে সাতআনা দুর্গামন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্নপূর্ণা পুজোর সময় মন্দিরের সামনে বলি দেওয়া হয়।

প্রাচীনতার লক্ষণ হিসেবে কিংবদন্তির জন্ম। কানাই চন্ডী সম্পর্কেও সেরকমের কিংবদন্তির শেষ নেই। তার অন্যতম হল এরকমের। কোনও কালে জমিদার বাড়িতে ডাকাত পড়ে। ডাকাতেরা ধন-রত্ন লুট করে পালানোর সময় কানাই চন্ডী মন্দিরের কাছে এসে অন্ধ হয়ে যায় এবং মন্দিরের দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। সকালে গ্রামবাসীরা এ-দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যান। ডাকাতেরা অন্ধ বা কানা হয়ে গেছিল বলেই কঙ্কচন্ডীর অপর নাম কানাই চন্ডী। বর্তমানে ওই মন্দিরেই একটি শিবলিঙ্গও বিরাজ করেছেন। জমিদার রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাশী থেকে লিঙ্গ টি এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চন্ডীদেবীর ও শিবের বর্তমান পুজারির নাম মানিক চক্রবর্তী।

তারা মা : তারামায়ের বর্তমান মন্দিরটি সমতল ছাদের। কিছুদিন আগে মন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছে। শোনা যায় –কাগ্রামবাসী শক্তিপদ ভট্টাচার্যের পূর্বপুরুষ গ্রামের মাঠ থেকে তারামায়ের মূর্তি কুড়িয়ে পান। নিজের বাড়িতে এনে দেবীর পুজোর ব্যবস্থা করেন। রাতে দেবী স্বপ্নে বলেন যে তার যথাযথ পুজো এবাড়িতে হচ্ছে না। কাজেই তাঁকে যে কোনও বিত্তবান ভক্তের বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। সেমতো দেবী জমিদার চৌধুরী বাড়িতে অধিস্থিত হন। চৌধুরীবাবুরা

ভক্তিসহকারে দেবী মন্দির নিজ বসতবাড়ির মধ্যেই তৈরি করে দেন এবং তাঁর পুজোর খরচ নির্বাহের জন্য স্থায়ী দেবোত্তর জমির ব্যবস্থা করেন। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা - পূজো, মাছ সহযোগে অন্নভোগ এবং প্রতি অমাবস্যায় বলিদানের ব্যবস্থা থাকে। অতীতে একসময় মার মূর্তিটি চুরি হয়ে যায়। শোনা যায় চোর দেবীর ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে মাঝপথে মূর্তিটিকে পুকুরে ফেলে পালায়। কয়েক বছর আগে পুকুর থেকে দেবী মূর্তিটি পুনরুদ্ধার করে সকলের সহযোগিতায় পুরোনো মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ভট্টাচার্য বংশীয়দের আজও ওই বংশের পুরুষেরা নিজেদেরকে দেবীর ভ্রাতৃস্থানায় বলে মনে করেন। তাই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় তাঁকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘরের মেয়ের মতো পুজো হয় পঞ্চমুন্ডির আসনে বসিয়ে এবং দেবীকে সাক্ষী রেখে তাঁরা ভাই-ফোঁটার টিপ কপালে পরেন। জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাসহ দেবী যান ব্যানার্জি বাড়ির পুজো মন্ডপে। আবার দীপান্বিতা পূজার চতুর্থীকে মা তারাকে চ্যাটার্জি বাড়ির ক্ষেপাকালীতলায় নিয়ে যাওয়াও রেওয়াজ আছে।

দেবী কালো কষ্টিপাথরে রিলিফ পদ্ধতিতে খোদিত বারো ইঞ্চি প্রায় এক চতুর্ভুজা বসনপরিহিতা কালিকা মূর্তি। পদতলে পদ্মোপরি শায়িত মহাদেব, হাতে শিঙা। দেবীর গলায় রত্নহার ও মুন্ডমালা।

দেবী ইচ্ছাময়ী : উত্তর পাড়ায় ইচ্ছাময়ী কালীর সুন্দর একটি মন্দির আছে। প্রতিবছর অবশ্য দেবীর পুজো হয় না। যে বছর দেবী স্বেচ্ছায় শিশুর মতো কণ্ঠস্বরে রাতে চিৎকার করেন সেবছরই মাত্র আড়ম্বরে দেবীর পুজোর ব্যবস্থা করা হয়। বলা বাহুল্য এসব কারণেই দেবী অত্যন্ত জাগ্রতা। তাঁর প্রতিষ্ঠার কোনও সাল তারিখ পাওয়া যায় না।

গন্ধেশ্বরী পুজো : এই পুজো মূলত গন্ধবণিক সম্প্রদায়েরা করে থাকেন। প্রস্তরময়ী দেবীর অধিষ্ঠান রয়েছে নিগম-বনকাপাশির কাছে শিমুলিয়া গ্রামে। কাগ্রামে দেবীর স্থায়ী বিগ্রহ কোনও কালে ছিল না বটে তবে পুজো ছিল। এখনকার রায়পাড়ার শ্রীধর জিউ মন্দিরে মৃন্ময়ী গন্ধেশ্বরী দেবীকে অতীতে আনা হত। এখন আর তা হয় না। কাটোয়ার বহু গন্ধবণিক পরিবারের ভদ্রাসন রয়েছে কাগ্রামে। অতীতে হয়ত তাঁদের উৎসাহেই গন্ধেশ্বরী দেবীর পুজো হত বলে মনে হয়। এখন তাঁরাও নেই, পুজোও নেই।

ভট্টাচার্যিদের ক্ষেপাকারী : গ্রামের তিন কালীর মধ্যে এই কালীকে বড়ো বোন হিসেবে দেখা হয়। প্রাচীনতার নজির হিসেবে রয়েছে পঞ্চমুন্ডির আসন। বিশ্বাসীর নজরে বলিদানের সময় মা অত্যন্ত ভয়ঙ্করী সাজে দেখা দেন বলে মায়ের পায়ে শিকল বেঁধে রাখার রেওয়াজ আছে। মা অত্যন্ত জাগ্রতা। তাঁকে নিয়ে কিংবদন্তির ছড়াছড়ি। কথিত আছে– মহাদেব স্বয়ং উপস্থিত হয়ে পুজারি আনন্দ ও সদানন্দ ভট্টাচার্যের কাছে মার পুজোর প্রসাদ চেয়েছিলেন। প্রসাদ নিয়ে এসে দেখেন মহাদেব ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। শক্তি ভট্টাচার্য মহাশয় মহাদেবের মাথায় জড়ানো মাটির সাপের জিব নড়তে দেখেন। বাগদি পাড়ার এক ভক্তিমতী বৌ কয়েক বছর আগে মাকে সাক্ষাৎ দেখতে পান। আবার কয়েক বছর আগে কয়েকজন মজুর গ্রীষ্মের রাতে মন্দিরে শুয়ে ছিলেন। তাঁরা ততটা বাছবিচার না করে মন্দির প্রাঙ্গণে থুথু ফেলেন। সে-অপরাথে তাঁরা অচৈতন্য হয়ে পড়েন বলে কথিত।

রবীন্দ্র সংঘের কালী : কাগ্রামের রাজ পাড়ায় দু-দশক ধরে এই শ্যামাকালী পুজো চলছে। আগে এখানে গাঙ্গুলিদের পুজো হত। পরে ক্লাবের উৎসাহে পুজো হত। পরে ক্লাবের উৎসাহে পুজো হতে থাকে। এই কালীকে মধ্যম বোন বলা হয়। বিসর্জনের দিনে এখানে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণের রীতি আছে।

পন্ডিতদের পুজো : এই পুজোকে ছোটো বোনের পুজো বলা হয়। সঠিক হোক কিংবা অনুমান, পন্ডিতদের পুজোর ইতিহাসের সঙ্গে কাগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাঁরা দাবি করেন তাঁরা হলেন সালারের শালিবাহন রাজাদের কুলপুরোহিত বংশ। অজ্ঞাত কোনও কারণে তাঁরা কাগ্রামে এসে বসবাস করেছেন। সম্মান-নজির হিসেবে বলেন, একমাত্র তাঁদের কালীপুজোতেই গ্রামের জমিদার বংশ পাঁঠা ধরতে আসতেন। আবার যদিও এখন মূর্তির উচ্চতা স্বাভাবিক কিন্তু অতীতে উচ্চতা ছিল পঁচিশ পোয়া মানে সওয়া ছয় হাত। ওদিকে বাড়িতে রয়েছে মঙ্গলচন্ডীর ডোবা। সেখান থেকে একসময় প্রচুর প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে। কাছেই চূণ-সুরকির গাঁথনিযুক্ত প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ ছিল বলে অনেকে দাবি করেন। এখন অতি যত্নসহকারে দেখলে কিছুটা বোঝা যায় মাত্র, তবে পরিষ্কার কিছু নয়। মুসলিম পাড়ার এক পুকুর থেকে পাওয়া পানিশঙ্খ আর পিতলের একটি ইঞ্চি দুয়েকের গণেশ মূর্তি তাঁদের হেফাজতে আছে। পাওয়া গেছে কয়েকটা মাটির প্রদীপ, ঠিলি ও নানা রকমের মাটির পাত্র, প্রাচীন কিনা সহজে বলা যাবে না। আর রয়েছে একটি পাথরে ইঞ্চি বারো মতো মাথা ভাঙা শিবলিঙ্গ নাম বর্গিকাটা শিব। এগুলি প্রাচীন হোক কিংবা নবীন গ্রামবাসী কিন্তু এগুলি দেখিয়েই প্রাচীনতার দাবি তোলেন।

হাতকাটি কালী পুজো : ১১০৩ বঙ্গাব্দে রামেশ্বর চক্রবর্তী এই পুজোর সূচনা করেন বলে শোনা যায়। কেন এরকমের বিচিত্র নাম সেসম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারেন না। দেবী ডাকের সাজে সজ্জিত থাকেন। সেখানে জোড়া বলিদান হয়।

ঠ্যাংকাটি কালী পুজো : এখানেও তাই, নামকরণের ব্যাপারে সকলে নীরব। তবে তাঁরা বলেন, প্রায় শত খানেক বছর আগে তাঁতি পাড়ার দীনবন্ধু ভট্টাচার্য প্রথমে এই পুজো এনেছিলেন। এখন তাঁর উত্তরসূরিরা সে দায়িত্ব পালন করে

চলেছেন।

রাখালদাস ব্যানার্জির কালী পুজো শুরু প্রায় দেশ-শো বছর আগের ঘটনা। মাটির মন্দিরের জায়গায় এখন পাকা মন্দির। কিংবদন্তি– জমিদারবাবু বসে আছেন। এক কালো মেয়ে তাঁর সঙ্গে গল্প শুরু করেন। জানতে চান, তিনি এত বড়ো জমিদার অথচ তিনি কেন কালীপুজোর ব্যবস্থা করেন না ইত্যাদি। সেদিন রাতেই জমিদার পত্নী স্বপ্নে মাকালীর আদেশ পান যে ভাজা-পোড়া ভোগ দিয়ে মার পুজোর প্রচল করতে হবে। সে থেকে কালীপুজোর শুরু।

রামপন্ডিতের কালী : জমিদার রাখালদাস ব্যানার্জির ভাই রাম পন্ডিত তাঁর বড়ো ভাই-এর কালী মূর্তির এক মুঠো খড় এনে নতুন করে কালী পূজোর সূচনা করেন। সে থেকে ওই পুজো যথাযথ চলে আসছে। কিংবদন্তি হিসেবে যে কাহিনিটি প্রচলিত আছে তার সারাংশ হল– কোনও একবার তাঁরা ডাকিনী-যোগিনী সহ শ্মশানকালীর মূর্তি তৈরি করেন। কিন্তু পুজোর আগের দিনই তাঁদের বংশের এক কন্যা জলে ডুবে মারা যায় এবং গাই-গোরুরও মৃত্যু ঘটে। স্বভাবতই আবার স্বাভাবিক মূর্তিতে পুজো চলতে থাকে।

সারদা প্রসাদ ভট্টাচার্যের পুজো : আনুমানিক দেড় শো বছর আগে তিনি পুজোর সূচনা করেন। বর্তমানে পাকা মন্দিরে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও আদিত্য নারায়ণ ভট্টাচার্য ওই পুজো চালিয়ে যাচ্ছে।

শিবপ্রসাদ চ্যাটার্জির পুজো : কমবেশি দুশো বছর আগে এই পুজোর শুভ সূচনা হয় বলে ধারণা। ১৪১৩ বঙ্গাব্দে নতুন পাকা মন্দির তৈরি হয়েছে। বলিদান হয় তিনটি।

দ্বিজপদ চক্রবর্তীর ন্যাড়া কালীপুজো শুরু করেন তাঁর পূর্বপুরুষেরা প্রায় দুশো বছর আগে। কিংবদন্তি আছে এখানেও। চোরেরা দেবীর জিনিস-পত্র চুরি করতে এসে দেবীর কৃপায় খালি হাতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কড়ি বরগার প্রাচীন মন্দিরটি সম্প্রতি সংস্কার করা হয়েছে। তবে নামকরণের ব্যাপারে এখানেও সকলে নীরব।

ঘটকদের কালী পুজোর সূচনা ১২৬০ বঙ্গাব্দে। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিহারীলাল ঘটক ও ক্ষেত্রনাথ ঘটকের নাম শোনা যায়। বর্তমানের পাকা মন্দিরটি তৈরি করেছেন অজিত ঘটক মহাশয়। অতীতে মোষ বলিদান হত। এখন একটি কিংবদন্তি শোনা যায়– হরকালী ব্যানার্জি মহাশয় পুকুরে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সাত দিন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকেন। চিকিৎসকেরা জবাব দেন। শেষ পর্যন্ত মার প্রসাদ মাত্র সম্বল করে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলা হয়। সে-থেকে দেবীর মাহাত্ম্য চারদিকে প্রকাশ পায়।

রায়বাড়ির কালি পুজোও কম পুরোনো নয়। প্রতিষ্ঠাতা জমিদার শম্ভুনাথ রায়। ডাকের সাজে দেবী সজ্জিতা থাকেন। আসলে রায়বাড়ির অন্যান্য পুজোর তুলনায় কালীপুজোই হল প্রাচীনতম। তাই এত ধূমধাম। কিংবদন্তি –দেবীর নামমাত্র সম্বল করে অগ্রদ্বীপে এক পুরোহিত হোমকুন্ডের অগ্নি স্বতঃস্ফূর্ত প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। তা-থেকে দেবীর মাহাত্ম্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তাঁতিপাড়ার মধুসূদন চক্রবর্তীর বাড়ির পুজো বেশ প্রাচীন কিন্তু তার সঠিক সাল তারিখ পাওয়া যায় না।

ভবানীশঙ্কর ব্যানার্জির কালী : প্রায় সত্তর বছর আগে এই কালী পুজোর প্রচলন হয়েছে দক্ষিণ পাড়ার ব্যানার্জি বাড়িতে।

এককড়ি চক্রবর্তীর পুজো : ত্রিশ বছর ধরে বাউড়ি তলার কাছে রয়েছে দেবীর পুজোর বেদি। এখানকার কালীকে নেড়া কালী বলে।

বিজয় মন্ডলের পুজো : পঁচিশ বছর ধরে বৈষ্ণব মতে চলছে। এখানেও স্বপ্ন, এক উলঙ্গ বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে পথে দেখা। মেয়েটি তাঁদের বাড়ি যেতে চায় কিন্তু যেতে যেতেই অদৃশ্য। রাতে স্বপ্ন– পুজো দিতে হবে। সেমতো পুজোর ঘটা।

গৌতম ঘোষের পুজো : বছর আঠেরো আগে গৌতম ঘোষ শ্যামা কালীপুজোর প্রচল করেন।

আদিনাথ ঘোষের পুজো : পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষায় সাম্প্রতিক কালে অনুষ্ঠিত একটি পুজো।

নারায়ণ হাজরার পুজো : বছর দশের আগে স্বপ্ন পেয়ে পুজোর সূচনা। বলিদান হয়।

রানি হাজবার পুজো : কয়েক দশক ধরে এই পুজো চলছে। বলিদান হয়।

হারু হাজরার পুজো বছর চার পাঁচেক ধরে শুরু। এখানেও স্বপনের নির্দেশ আছে।

কৃষ্ণকিঙ্কর সাহার কালী : সত্তর বছর আগে কৃষ্ণকিঙ্কর সাহা কাগ্রামের উত্তর পাড়ায় এই পুজো চালু করেন স্বপ্নাদেশ পেয়ে। বছর চারেক চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। এখন আদ্যনাথ সাহার উদ্যোগে বছর দুয়েক থেকে আবার আরম্ভ হয়েছে।

নিমুঠাকরুণের পুজো : বাউরি তলার চ্যাটার্জি বাড়িতে বহুকাল ধরে পুজো হচ্ছে, নাম ক্ষেপাকালী। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে মন্দির তৈরি হয়েছে।

ছান্দিক ক্লাবের পুজো : ১৯৮৬ খ্রিস্বাদে বাবলু দাস ও কিশোর দাস নামে দুই যুবক ক্লাবের উদ্যোগে এই কালীপুজো চালু করেন।

কালীপুজোর প্রসঙ্গ এখানেই শেষ।

গ্রামে দুটি আশ্রমের সন্ধান পাওয়া গেছে। গ্রামবাসী মাধব ঘোষ মহাশয় কয়েকটি প্রশ্নসহ আশ্রমের বিবরণ সংগ্রহ

করে এসেছেন। তাঁর প্রশ্নসহ বিবরণগুলি এরকমের।–

১। কাগ্রাম রায়পাড়ার অবস্থিত সন্ন্যাসিনী শান্তিমা পরিচালিত প্রথম আশ্রমটির নাম শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানানন্দ সাংখ্যযোগ সেবাশ্রম। স্থাপিত– ২৫শে বৈশাখ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

২। ধর্মমত : শ্বেতাশ্বতর সংখ্যা

৩। সম্প্রদায় : সাংখ্যযোগ সম্প্রদায়

৪। আরাধ্য বিগ্রহ : সদ্‌গুরু শ্রীমদ্ স্বামীকপিলানন্দ মহারাজের চিত্রপট

৫। নিত্যসেবা : ফলমূল মিষ্টান্নসহ সকাল ৯টা ও সন্ধে সাড়ে ছ'টা।

৬। ধ্যানমন্ত্র : নারায়ণের ধ্যানে কপিলানন্দজির উপাসনা।

৭। বিশ্বাস : ১৩৫০ বঙ্গাব্দে৫ ১৫ শ্রাবণ রবিবার অমাবস্যা তিথিযোগে কর্কট রাশিতে রবি চন্দ্র, বৃহস্পতি এবং পুষ্যা নক্ষত্রের একত্র সমাবেশ ঘটায় ওই দিন কলিযুগের অবসান এবং পরের দিন শুক্লা প্রতিপদে সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে।
যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা পুষ্যা বৃহস্পতি। এক রাশে সমেস্বস্তি তদা ভবতি তৎ কৃতম। (শ্রীমদ্‌ভাগবত ১২/২/২৪)

৮। বাৎসরিক উৎসব : অক্ষয় তৃতীয়ার অষ্টপ্রহর তারাকব্রহ্ম নাম সংকীর্তন–নারায়ণঃ পরাবেদাঃ নারায়নঃ পরাগতিঃ। তারপর নরনারায়ণ সেবা।

৯। আয় : শান্তিমায়ের মাধুকরী ও দান-গ্রহণ

১০। ব্যায় : ঠাকুরের নিত্যসেবা ও সমাগত অতিথি সেবা।

১১। দীক্ষা : কিছু গৃহী শিষ্যকে দীক্ষা দেওযা হয়েছে

১২। বিশেষ : শান্তিমায়ের বক্তব্য– সদ্ ধর্ম প্রচার ও প্রসার। ধর্মপরায়ণ মানুষের সহযোগিতা কামনা, আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি কামনা, মানুষকে ঈশ্বরমুখী করা।

দ্বিতীয়টি :–

১। কাগ্রাম উত্তর পশ্চিম প্রান্তে জল-সরবরাহ ট্যাঙ্কের উত্তরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে কাগ্রাম ভাগবত সেবাশ্রম। স্থাপিত–মাঘী সপ্তমী ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ। প্রতিষ্ঠাতা–তৎকালিক ভাগবত সংঘের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীনিরঞ্জন দাস ও মৃত্যুঞ্জয় সাহা।

২। ধর্মমত : বৈষ্ণব ধর্ম

৩। সম্প্রদায় : গৌড়ীর মাধ্বাচার্য

৪। আরাধ্য বিগ্রহ : রাধাকৃষ্ণ চিত্রপট

৫। নিত্যসেবা : স্থায়ী সেবাইত না থাকায় নিত্যসেবা বন্ধ আছে।

৬। ধ্যানমন্ত্র : গুহা।

৭। বিশ্বাস : জীব সেবাই ধর্ম।

৮। বাৎসরিক উৎসব : চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে প্রথম মঙ্গলবারে কালীপুজো ও মহোৎসব। পূর্বে মাঘী সপ্তমীতে হরিনাম যজ্ঞ নারায়ায়ণ সেবা হত।

৯। আয় : গৃহস্থের বাড়িতে ঠাকুরের নামগান, ভাগবত পাঠ আদি প্রণামী।

১১। ব্যায় : আশ্রমের পুজো আদি ও গৃহ সংস্কার।

১২। দীক্ষা : অতীতে সন্ন্যাসী থাকতেন এবং তিনি দীক্ষা দিতেন। এখন কোনও সন্ন্যসী থাকেন না বলে দীক্ষা দেওয়া বন্ধ আছে।

১৩। বিশেষ : শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা পুজো গত কয়েক বছর ধরে হয়ে আসছে। সেকারণে শ্রীমন্টু মন্ডলের উদ্যোগে আশ্রমে মনসা মন্দির নির্মিত হচ্ছে। স্থায়ী সন্ন্যাসী এসে অবস্থান করলে অন্যান্য বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হবে।

কাগ্রাম-টেরাকোটা

কাগ্রামের মন্দির ও দেবদেবীর কথা বলা হল এতক্ষণ। কার্যত সে-ব্যাপারে কাগ্রাম আর পাঁচটা গ্রামের মতোই সাধারণ। কিন্তু যে ব্যাপারে এই গ্রামকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া যায় তা হল কাগ্রামের রেখদেউল কাঠামোতে পীঢ় রীতির দুটি মন্দিরের টেরাকোটা-সজ্জা। মন্দির অবশ্য এমন কিছু প্রাচীন নয়। কোনও রকমের প্রতিষ্ঠালিপিও নেই তাতে। অভিজ্ঞজনের বক্তব্য কাগ্রামের জোড় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা বড়োজোর অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি। আসলে সে-গ্রামের হর বক্সী নামক

জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে কাজ করতেন। তিনিই ওই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। (বর্তমান থেকে অতীত: তপন কুমার চৌধুরী পিতা ননীগোপাল তস্য পিতা যোগীন্দ্রচন্দ্র তস্য পিতা পবন চৌধুরী, তস্য পিতামহ হরবক্সী) মুর্শিদাবাদ বাংলা গেজেটিয়ারও সেই একই কথা বলে। যদিও প্রামাণ্য কোনও নজির নেই তার। তবে মন্দিরের অগ্নিকোণে এখনও বক্সী পরিবারের ভদ্রাসন রয়েছে।[২৭] রেখ দেউলদুটিতে অবস্থিত শিবের নিত্যসেবা হয়। পুরোহিতের দক্ষিণাভার বহন করেন রায়চৌধুরী পরিবার। কোনও বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয় না।

রেখদেউল জোড় মন্দিরের পূর্বদিকে রয়েছে আরও দুটি চারচালা শিব মন্দির। তার দেওয়ালে কোনও টেরাকোটার কাজ নেই। প্রতিষ্ঠালিপিও নেই। তবে অনেকের কথা মতো প্রায় দেড় শো বছর আগে ওই মন্দির নির্মিত হয়। মন্দির দুটি কালীবাবুদের জোড়া শিব মন্দির নামে খ্যাত। তার পঞ্চাশ মিটার প্রায় ঈশানকোণে রয়েছে মিহির রায়চৌধুরীদের একটি আটচালা শিব মন্দির। দেওয়ালে টেরাকোটার ঘর কাটা আছে। খুব যত্ন করে দেখলে বোঝা যায় এখনও কয়েকটি ভগ্ন টেরাকোটা গায়ে সেঁটে রয়েছে। অর্থাৎ কোনও কালে এই মন্দিরও টেরাকোটা সাজে সজ্জিত ছিল। বয়স অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বলে অনুমান।

টেরাকোটা সজ্জিত জোড় রেখদেউলের পঞ্চাশ ষাট মিটার দক্ষিণে আরও দুটি চারচালা শিব মন্দির রয়েছে। মিহির রায়চৌধুরীদের জ্ঞাতি ভাই অরুণাংশ ও দেবাংশুবাবুর মতে ওই মন্দিরদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাঁদেরই পূর্বপুরুষ আন্দিমান রায়চৌধুরী। তিনি ছিলেন কাগ্রামেরই আদি বাসিন্দা। কাগ্রাম হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরীর মতে আন্দিমান রায়চৌধুরীর এক জমিদার বন্ধু ছিলেন মুসলিম। অজ্ঞাত কোনও কারণে মুসলিম বন্ধুর নাতি ছাড়া তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদেরই মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ জমিদার মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তিনি তাঁর মুমূর্ষু নাতিকে আন্দিমান রায়চৌধুরীর জিম্বায় রেখে হজে চলে যান এবং আর ফিরে আসেন না। দুর্ভাগ্যবশত নাতিটিরও অকাল মৃত্যু হলে পুরো জমিদারির মালিক হন আন্দিমান রায়চৌধুরী। তিনিই ছিলেন ওই জোড়া মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মতান্তরে মুসলিম জমিদার ভদ্রলোক মক্কাতে অবস্থান করতেন। এখান থেকে নিয়মিত তাঁর জমিদারির সমস্ত উদ্বৃস্ত আয় হিসেব করে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হত। তিনি একসময় কাগ্রাম ফিরেও আসেন। কিন্তু নাতি ততদিনে মারা গেছে। সে দুঃখে তিনি সমস্ত সম্পত্তি চৌধুরী বংশীয়দের হাতে তুলে দিয়ে আবার মক্কায় ফিরে যান। আর কোনও দিন তিনি ফিরে আসেন না।